শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্ত্তিকা

২৪ নভেম্বর, ১৯৫৪

বর্ষ—১৪ সংখ্যা—৪

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৫শে নভেম্বর, ১৯৫৪)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা ১২

১। মায়ের প্রার্থনা
২। শারীর চেতনার আরো অভিজ্ঞতা — শ্রীমা
৩। একটি স্বপ্ন — ঐ
৪। শ্রীঅরবিন্দের একখানি পুরানো পত্র
৫। দিব্য-জীবন — অনির্বাণ
৬। শ্রীঅরবিন্দ-স্মরণে — শ্রীসজনীকান্ত দাস
৭। ঈশোপনিষদ — শ্রীঅরবিন্দ
৮। শিশুসঙ্গে শ্রীমা
৯। আবির্ভাব (কবিতা) — শ্রীরবি গুপ্ত

মূল্য—১৲ টাকা

742-'54-500

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

মহত্তম হোক আর ক্ষুদ্রতম হোক আমাদের মধ্যে সকলেরই সামর্থ্য আমাদের নিজস্ব নয়, আমাদের তা দেওয়া হয়েছে যে-খেলায় আমাদের যোগদান করতে হবে, যে কাজটি করতে হবে তার জন্যে। সামর্থ্য আমাদের গড়ে তোলা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার বর্তমান রূপ চরম রূপটি নয়—সামর্থ্যের রূপ নয়, অসামর্থ্যের রূপও নয়। যে কোন মুহূর্তে রূপের পরিবর্তন ঘটতে পারে, যে কোন মুহূর্তে দেখা যায় অসামর্থ্য সামর্থ্যে পরিণত হয়ে চলেছে, দুর্ব্বল সবল হয়ে উঠেছে, আধারের চেতনা ধীরে বা অকস্মাৎ নূতন প্রসার লাভ করছে, সুপ্ত ক্ষমতা সব পরিস্ফুট করে চলেছে। আমাদের ঊর্দ্ধে, আমাদের অন্তরে, আমাদের বাহিরে বিরাজিত সর্ব্বশক্তি, তারই উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে আমাদের কর্ম্মের জন্য, আমাদের ক্রমোন্নতির জন্য, আমাদের রূপান্তরের জন্য। আমাদের কার্য্যের উপর, আমাদের কার্য্যকারিতার উপর, অধিষ্ঠাত্রী শক্তির উপর নিষ্ঠা রেখে যদি চলি আমরা, তাহলে আমাদের পরীক্ষার মুহূর্ত্তে, বিঘ্ন বিফলতার সম্মুখীন হবার জয় করবার সময়েই শক্তি আমাদের আসবে, আমাদের সামর্থ্য ঠিক ততখানিই হয়ে উঠবে যতখানি সর্ব্বশক্তিময় থেকে আমাদের প্রয়োজন, যতখানি তার সুষ্ঠু হতে সুষ্ঠুতর যন্ত্র আমরা হয়ে উঠতে থাকব।

শ্রীঅরবিন্দ

মায়ের প্রার্থনা

সেপ্টেম্বর ১০, ১৯১৪

তোমার প্রেম উচ্ছ্বসিত জোয়ারের মত সমগ্র সত্তাকে ঘিরে ধরেছে, সকল জিনিষের উপর ছেয়ে পড়েছে। ভগবান, তোমার প্রেম সকল হৃদয়ে প্রবেশ করবে, সেখানে জাগিয়ে তুলবে সেই দিব্য শিখা যার নির্বাণ নাই, সেই দিব্যসুষমা যার পরিবর্ত্তন নাই, সকল বৈরূপ্য, সকল বৈপরীত্য পার হয়ে সকলের মধ্যে সে স্থাপন করবে সেই অক্ষয় আনন্দ যা আবার পরম আনুকূল্য।

তোমার জ্যোতি উচ্ছ্বসিত জোয়ারের মত সমগ্র সত্তাকে ঘিরে ধরেছে, সকল জিনিষের উপর ছেয়ে পড়েছে। ভগবান, তোমার জ্যোতি সকল মনে প্রবেশ করবে, সেখানে জাগিয়ে তুলবে সেই পরমা ভাতি যার স্পন্দ নাই, সেই শুভ্রদৃষ্টি যার ভ্রান্তি নাই, সকল বৈরূপ্য, সকল বৈপরীত্য পার হয়ে সকলের মধ্যে সে স্থাপন করবে তোমার জ্ঞানের সেই প্রভা যা হল আবার পরম অতিজ্ঞা।

শক্তি তোমার উচ্ছ্বসিত জোয়ারের মত সমস্ত সত্তাকে ঘিরে ধরেছে, সকল জিনিষের উপর ছেয়ে পড়েছে। ভগবান, তোমার শক্তি সকল প্রাণে প্রবেশ করবে, সেখানে জাগিয়ে তুলবে সেই সকল সামর্থ্য যার স্খলন নাই, সেই দিব্যবল যার পরাজয় নাই, আর সকল বৈরূপ্য সকল বৈপরীত্য পার হয়ে সকলের মধ্যে সে স্থাপন করবে তোমার সেই সমুচ্চ বীর্য্য যা হল আবার পরম এষণা।

সেপ্টেম্বর ১৩, ১৯১৪

সাগ্রহ প্রণতি তোমায়, হে জগৎ-জননী। নিবিড় অনুরাগে তোমার সঙ্গে আমি একাত্ম হয়ে যাই। ভগবতী জননীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে আমি ফিরে দাঁড়াই তোমার দিকে, হে ভগবান, মূক আরাধনায় তোমায় প্রণতি জানাই, তীব্র আশ্লুতা নিয়ে আমি একাত্ম হয়ে যাই তোমার সঙ্গে।

সব তারপর হয়ে ওঠে অপরূপ নীরবতা, সৎ অসতের মধ্যে মিশে যায়, সব হয় স্থগিত, স্তব্ধ, অচল।

অধ্যাত্মাকাশকে কি করে প্রকাশ করা যায়?

সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯১৪

আমি আর নাই, নাই বাষ্টির, নাই ব্যক্তিগত সীমা। শুধু আছে আমাদের বিশ্ব-জননী। এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড, সে জ্বলছে শুদ্ধির জ্বলন্ত আগুনে, তোমাকে লক্ষ্য করে, হে ভগবান, হে দিব্য অধিরাজ, হে পরমা এষণা, এই জন্যে যেন তোমার এষণা তার সিদ্ধির পথে কোন বাধা আর না পায়।

তোমার দিকে উঠে চলেছে তীব্র প্রেমের, মহা উল্লাসের এক বিপুল গান। ভগবান, সমস্ত পৃথিবী তোমার সঙ্গে সম্মিলিত হয় এক অবর্ণনীয় রভসে।

তোমার সবল ফুৎকার অগ্নিকুণ্ডকে জ্বালিয়ে রাখে যেন, যেন ক্রমে তা হয়ে ওঠে আরো বিশালে দুর্দমনীয়; সকল তিমির, সকল অন্ধ বাধা যেন আত্মসাৎ করা হয়, দাহন করা হয়, জ্যোতিতে রূপান্তরিত করা হয় তোমার অপরূপ শুদ্ধিদাত্রী শিখায়।

কি শান্তিদায়ী উজ্জ্বলতা তোমার পাবকশক্তির!

সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯১৪

শোন জাগে কোন কণ্ঠ, ওঠে কোন গান দিবা-উষাকে বরণ করবার জন্যে। পরম দিবান পূর্ব হোক—তা যদি হয় বিশ্বভূত শাশ্বত সত্তা অথবা হয় যদি অসতের মধ্যে পুনঃ-বিলয়, কি আসে যায়? দুটির একটিকে বেছে নিতে হবে? আমি তা পারি না। আমার চেতনায় কোন পক্ষপাত নেই, জেগে আছে একমাত্র ইচ্ছা, তা হল তোমারই, হে বাক্যাতীত!

সমস্ত বিশ্ব শুধু একখানা গান এখন, ক্রমে তা বিশালতর সূক্ষ্মতর হয়ে চলেছে তোমার দিব্য উষাকে বরণ করবার জন্যে।

সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯১৪

বাহিরে থেকে হোক কি কোন জগৎবিশেষ থেকে হোক কাজের প্রেরণা আর আসে না। ভগবান, এক তুমি সকল জিনিষ সচল করে ধরেছ সত্তার গভীরতা থেকে, তোমারই ইচ্ছাশক্তি করে পরিচালনা, তোমার কর্মবলই করে কর্ম—একটা ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত চেতনার সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যে কেবল নয়, করে এমন চেতনার ক্ষেত্রে, যা বিশ্বভূত, যা সত্তার প্রত্যেক

অবস্থাতেই সমগ্রের সঙ্গে একীভূত। সে-সত্তার যুগপৎ সজ্ঞান-বোধ রয়েছে এক দিকে বিশ্বব্যাপী যাবতীয় জ্ঞানে, এমন কি বিশৃঙ্খল গতিবৃত্তির, অন্যদিকে তোমার পরম অব্যয়তার নীরব পরিপূর্ণ শান্তির।

সেপ্টেম্বর ২০, ১৯১৪

লেখনী মূক, কারণ মন নীরব—কিন্তু হৃদয় আশ্পৃহায় ভরে তোমার দিকে উঠে চলেছে, ভগবান, তোমাকে এক করে ধরেছে আমাদের ভগবতী মায়ের সঙ্গে, একই প্রেমের একই ভক্তির মধ্যে। তোমাকে আশ্রয় করে সমগ্র সত্তা বাক্যাতীতের দিকে উন্মুখ, সত্তার ওপারে, নীরবতার ওপারে সে-বস্তু তৎ-বস্তুর সঙ্গে সম্মিলিত।

সেপ্টেম্বর ২২, ১৯১৪

ভগবান! অজ্ঞেয়ের দুয়ার তুমি, প্রণতি তোমায়।

কিন্তু এ কি তুমি তোমাকেই প্রণতি জানাও না—তোমার সেই পদবীতে যেখানে তুমি পরাসত্তার অচিন্ত্য সার সত্তা, যা রয়েছে অপরিমেয় গভীরের অন্তরে, আবার যেখানে তুমি নিজেকে বাহ্যতনরূপে বাস্তব করে ধরেছ সেখানে পর্য্যন্ত? কারণ পরা-সত্তা হলে তুমি, সে-সত্তার ধারা যাই হোক না; আবার অচিন্ত্য শাশ্বতও তুমি, তা হল তোমার সার-সত্তা। এই অখণ্ড চেতনাকে তুমি আমাদের করে ধরেছ, যাতে আমরা তুমি হয়ে উঠতে পারি শুধু আত্মিমূলে নয়, পরন্তু সচেতনভাবে সক্রিয়ভাবে। ফলতঃ সবই হল সপ্রেম ও সভক্তি আনন্দময় আদান-প্রদান, পরস্পর অভিবাদন; তা হল আমাদের মায়ের তীব্র আশ্পৃহা তোমার দিকে আর তোমার অসীম বলিষ্ঠ প্রত্যুত্তর মায়ের দিকে, সে আশ্পৃহা তোমার নিজের সমগ্র সত্তায়, এখনো যা অভিব্যক্ত হয় নি তার দিকে, সেই অজ্ঞেয়ের দিকে যাকে আমরা জ্ঞানের ক্রমে অধিকতর ভাবে সুষ্ঠুতরভাবে, যদিও তা চিরকালই অজ্ঞেয়ই রয়ে যাবে।

পূর্ণ নীরবতায় সবই আছে—অস্তি—নিত্য বর্ত্তমান; বিশ্বপ্রকাশের মধ্যে সবই হয়ে উঠবে, চিরন্তন সম্ভূতির ধারায়।

চেতনার এবং অখণ্ডজীবনের সর্ব্বসিদ্ধি ধরে সত্তা পায় আনন্দের স্তুতিগান, তাকে লক্ষ্য করে যা যুগপৎ আছে এবং হয়ে উঠছে নিত্যকাল।

বিশ্বের অধীশ, প্রণতি তোমায়। তুমি ত, যা-আছে ও যা-হবে উভয়ের মধ্যস্থ, কারণ তুমি একাধারে যা-আছে ও যা-হবে।

অত্যাশ্চর্য্য হে বৃহৎ, যুগপৎ তুমি গোচর ও অলিঙ্গ, পরিপূর্ণ জ্ঞানালোকে প্রণতি জানাই তোমায়।

সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯১৪

এই ত তুমি উপস্থিত আমাদের মধ্যে, মধুময়ী মা! মনে হয় তুমি চাও তোমার পূর্ণ সহযোগ সম্বন্ধে আমরা যেন নিশ্চিন্ত হই, তুমি চাও আমাদের দেখাতে যে যে-ইচ্ছাশক্তি আমাদের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে উৎসুক, সে পেয়েছে আধার সব, যারা তার দিব্য-বিধান পরিপালন করবে—বর্তমানে কি সম্ভব তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করে। যে-সব জিনিষ দেখা যায় অত্যন্ত দুরূহ, অত্যন্ত দুর্ঘট, এমন কি অত্যন্ত অসম্ভবই, তারাও হয়ে ওঠে একান্তই সুসাধ্য। কারণ তুমি রয়েছ, তাই আমরা নিঃসন্দেহ যে জড়জগৎ পর্যন্ত তৈরী হয়েছে, তোমার ইচ্ছাশক্তির, তোমার দিব্যবিধানের নবরূপ প্রকাশ করবার জন্যে।

সর্বাঙ্গ-সুন্দর মনুষ্যত্বের আপূর্ণ আনন্দে তোমায় স্থাপিত করি, স্বাগত তুমি, তোমার কর্ম আর তোমার নিত্যসত্তা।

সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯১৪

হে মধুময়ী জগৎ-জননী! তুমি যদি সঙ্গে থাক, তবে অসম্ভব কি আর? সিদ্ধির দিন সমাগত। তুমি আমাদের নিঃসন্দেহ করেছ যে পরম ইচ্ছাশক্তির সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা সাধনে তোমার সহযোগ রয়েছে।

একদিকে অচিন্ত্য সদবস্তু, অন্যদিকে আপেক্ষিক প্রপঞ্চ এই উভয়ের মধ্যস্থ করে আমাদের তুমি গ্রহণ করেছ, আমাদের মধ্যে তোমার নিত্য সান্নিধ্যই তোমার সক্রিয় সহযোগের প্রমাণ।

ভগবান সংকল্প করলাম, তুমি কর সিদ্ধি তার।
নূতন এক জ্যোতি পৃথিবীর উপর উদয় হবে।
নূতন এক জগৎ জন্মগ্রহণ করবে।
যা-কিছু প্রতিশ্রুত হয়েছিল, সব তা ফলবেই।

শারীর চেতনার আরো অভিজ্ঞতা

৪৯

অতীত জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখলেই যেন মনে হয় অনেক সময়ে আরো নির্ভুল করে কাজ করা যেত, যদিও সে-সব সময়ে চালিত হয়েছি ভিতরকার সত্যটির দ্বারাই। তার কারণ, গতিশীল এই বিশ্ব—কালকের পরিপূর্ণ সত্য আজকের আংশিক সত্যরূপে দেখা দেয়। কিম্বা আরো যথাযথভাবে বলতে গেলে, এক সময়ে যে ধরণের ক্রিয়া প্রয়োজন ছিল এখন আর তার দরকার হয়না, এখন অন্য রকম ক্রিয়া বেশি ফলপ্রসূ হবে।

বলি 'রূপান্তর', কথাটি তবু কিন্তু অস্পষ্ট থেকে যায়। ভাবা হয় একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে যার ফলে সব কিছু হবে ভালো। মোট ভাবটা দাঁড়ায় এই : যদি থাকে বাধাবিঘ্ন তবে সে-সব দূর হবে ; অসুস্থ রুগ্ন যারা তারা হয়ে উঠবে নিরাময় ; শরীর যদি হয় জরা-জীর্ণ অক্ষম তবে সে-সব থেকে লাভ হবে মুক্তি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমি বলেছি এ সবই খুব অস্পষ্টভাবে দেখা, একটা আবছায়া বোধ মাত্র। এখন শরীর-চেতনার সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য বিষয় হল যে কোনো জিনিস সম্বন্ধে তার নিখুঁত পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান হয় সেই জিনিসটিকে কর্মে ফলিয়ে তুলবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে। সুতরাং, রূপান্তরের পদ্ধতি যখন জানি পরিষ্কার, যখন জানি কোন কোন প্রক্রিয়া এবং পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আসে সর্বাঙ্গীণ রূপান্তর, কোন ক্রমানুসারে কি রকমে আসে, অর্থাৎ কোন কোন জিনিস আসবে প্রথমে, পরে আসবে কোন কোন জিনিস, সব যখন জানি বিশদভাবে তখন তা-ই হল ধ্রুব ইঙ্গিত যে উপলব্ধির শুভলগ্ন উপস্থিত। প্রতিবার যখনই তুমি সামান্য অংশটি পর্যন্ত জানো নির্ভুলভাবে তখনই তুমি তাকে বাস্তবে ফলিয়ে ধরবার জন্যে তৈরী।

আপাতত বিষয়টির একটা মোটা ধারণাই হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এ কথা তো নিশ্চিত সত্য যে অতিমানস আলোর প্রভাবে শরীরে চেতনারই প্রথম রূপান্তর হবে ; পরে আসবে শরীরের সকল যন্ত্রের ক্রিয়া এবং গতির উপর কর্তৃত্বের ক্রমবৃদ্ধি, তারপর ধীরে ধীরে এই কর্তৃত্বের পরিবর্তে আসবে এক আমূল রূপান্তর এসব ক্রিয়ার ধর্মে এবং, অবশেষে, শরীরের যন্ত্রগুলির গঠনে পর্যন্ত। এগুলি ঘটবেই, যদিও বুদ্ধির কাছে এখনো যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা ঘটবে—যখন দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের স্থান নেবে প্রত্যেকে নিজের নিজের ধর্ম অনুযায়ী চলে নানা শক্তি গুণ সত্তার সন্নিবিষ্ট হবার কেন্দ্র সব—তা একটা ভাবরূপেই

শুধু রয়েছে, শরীর তা ভালো বুঝতেও পারে না, কারণ সে রয়েছে সিদ্ধির থেকে দূরে, আর সিদ্ধির কেবল পূর্ণকণেই তা সে পরিপূর্ণ বুঝতে পারে।

* * *

প্রজননের পাশব প্রক্রিয়ার আর প্রয়োজন হবে না বলে অতিমানস দেহে লিঙ্গভেদের চিহ্নও থাকবে না।

মানুষী আকৃতি তার নিজস্ব সৌন্দর্য বজায় রাখবে এবং এখন থেকেই দেখতে পারা যায় তার কুদর্শন অঙ্গসৌষ্ঠব সব মিলিয়ে যাবে—পুরুষের জননেন্দ্রিয় এবং নারীর পয়োকোষ।

* * *

যেমন আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাছে তেমনি প্রাচীন আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কাছে দেহ যে দিব্য নয় তা শুধু তার বাহ্যরূপ তার একান্ত স্থূলমূর্তি মায়াময় বলে।

* * *

হে পরম সত্য, অতিমানস সত্য, এই দেহ স্পন্দিত এক গভীর কৃতজ্ঞতায়। পরম নিশ্চয়তাভরে তোমার দিকে নিয়ে যায় এমন সব অভিজ্ঞতা একে একে তুমি দিয়েছ তাকে। এমন অবস্থায় সে এসেছে এখন যখন তোমার সঙ্গে একাত্মতা শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, একমাত্র সম্ভব এবং স্বাভাবিক জিনিস।

দুই চরম প্রান্তের এই দুই অভিজ্ঞতা কি করে বর্ণনা করি? এক প্রান্তে বলি:

"ভগবান, সত্যসত্যই তোমার কাছে আসতে হলে, তোমার যোগ্য হতে হলে, অমর্যাদার শেষ সীমায় নেমে যেতে হয় অথচ হীন বোধ করা চলে না। মানুষের অশ্রদ্ধা সত্যকার মুক্তি এনে দেয়, একান্তভাবে তোমারই হবার যোগ্য করে তোলে।

আর এক প্রান্তে বলব:

"ভগবান, সত্যসত্যই তোমার কাছে আসতে হলে, তোমার যোগ্য হতে হলে, মানুষের চরম মর্যাদাভাজন হতে হবে অথচ তার জন্য গর্ব বোধ করা চলবে না। মানুষ যখন তোমাকে ভগবান বলে তখনই নিজের ত্রুটি বুঝতে পারা যায়, তখনই বোধ করা যায় তোমার সঙ্গে সত্যকার ও সম্পূর্ণ মিলনের প্রয়োজন।"

দুটি অভিজ্ঞতাই চলে যুগপৎ; একটি অপরটিকে বহিষ্কার করে না, বরং একে অন্যকে সম্পূর্ণ করে তীব্রতর হয়। এই তীব্রতার মাঝে আপ্লুতা হয়ে ওঠে আত্মা, যার উত্তরে শরীর কোষেও নেমে আসে তোমার স্পর্শ, শরীর মনে হয় এক সহস্রবর্ষের আধার—তার নিত্যচঞ্চল অগণ্য আলোকোজ্জ্বল কোষ অনুকোষ এক সর্বজয়ী অদৃশ্য হস্তের দ্বারা চালিত।"

---

* Bulletin of Physical Education, Vol vi No, 3 থেকে অনূদিত

একটি স্বপ্ন

শ্রীমা

পৃথিবীতে কোথাও এমন একটা জায়গা থাকা দরকার যেটার সম্বন্ধে কোন জাতিরই একথা বলার অধিকার থাকবে না যে, ওটা তার নিজস্ব এলাকাভুক্ত। সেখানে ভাল লোকেরা, অন্তরের অভীপ্সা যাদের অকপট তারা, সবাই স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারবে বিশ্বের নাগরিক হিসেবে। তারা মেনে চলবে একমাত্র আদেশ, এবং তা হল উর্ধ্বতন সত্যের আদেশ। স্থানটি হবে শান্তির, মিলনের এবং শৃঙ্খলার কেন্দ্রভূমি। সেখানে মানুষের অন্তরের যুদ্ধ করবার যত প্রবৃত্তি সে সবই নিযুক্ত হবে একমাত্র তার দুঃখদুর্দশার কারণগুলিকে জয় করবার জন্যে, তার নিজের যত দুর্বলতা, যত অজ্ঞানতা, সে সবকে কাটিয়ে উঠবার জন্যে, তার যত সংকীর্ণতা, যত সামর্থ্যের অভাব, সে সবকে দূর করবার জন্যে। সেখানে আত্মার প্রয়োজন এবং উন্নতির সকল প্রচেষ্টা সর্বপ্রথমে পাবে বিকাশের সুযোগ ; মানুষের যত বাসনা ও ভোগলিপ্সা, তার পার্থিব জীবনের যত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আমোদ প্রমোদের অন্বেষণ, এ সবের স্থান হবে নিচে। সেখানে শিশুরা তাদের আত্মার সঙ্গে সংযোগ না হারিয়ে বড় হয়ে উঠতে পারবে, তাদের সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভের ও বিকাশের সুযোগ পাবে। সেখানে তাদের শিক্ষা দেওয়া হবে পরীক্ষায় পাশ করবার জন্যে নয়, বা মানপত্র বা চাকরী লাভের জন্যে নয়। শিক্ষা দেওয়া হবে, যে সব গুণ বা শক্তি স্বাভাবিক ভাবে তাদের মধ্যে বর্তমান সেইগুলির সবাক উৎকর্ষের জন্যে, এবং যাতে অন্য সব নতুন গুণ তাদের মধ্যে জেগে ওঠে, তারই সাহায্যের জন্যে। এই স্থানটিতে লোকেরা পদক এবং পদ লাভের বদলে পাবে সেবা করবার সুযোগ এবং নানা সংগঠনের অধিকার। সবাইকেই শরীর ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ সব সমানভাবে দেওয়া হবে, এবং এখানে মানুষের বুদ্ধিগত, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে তাদের জীবনের সুখ সুবিধা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারা নয়, প্রকাশ পাবে তাদের নানা কর্তব্যের ও দায়িত্বভার বৃদ্ধির দ্বারা। চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতি সকল ললিত কলার মধ্যে দিয়ে সৌন্দর্য বিকাশের সুযোগ তারা সকলেই পাবে সমান ভাবে, এবং প্রত্যেকেরই এই সব শিল্পরসের আনন্দ উপভোগের অধিকার নির্দ্ধারিত হবে একমাত্র তাদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে, সামাজিক বা আর্থিক পদমর্যাদা বিবেচনা করে নয়। কারণ এই আদর্শ-স্থানটিতে অর্থই শ্রেষ্ঠ প্রভুত্বের আসন আর পাবেনা, মানুষের ব্যক্তিগত মূল্যই পাবে সম্পদ বা সামাজিক পদগৌরবের চেয়েও অনেক বেশি মর্যাদা। কাজ

এখানে মানুষের জীবিকা অর্জনের উপায় হবেনা, কাজ হবে তার আত্মবিকাশের পন্থা, তার ভিতরকার যত সামর্থ্য ও যত সম্ভাবনার পরিস্ফুরণের প্রণালী। সেই সঙ্গে কাজের দ্বারা সমগ্র সংঘের প্রতি হবে তার কর্তব্যপালন করা, এবং উক্ত সংঘ আবার প্রত্যেক মানুষের জীবন যাপনের সকল আবশ্যকীয় বস্তু সরবরাহ করবে, এবং প্রত্যেকের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করবে। এক কথায়, স্থানটি হবে এমন যে, এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, যা প্রায় ষোল আনাই প্রতিযোগিতা এবং সংঘর্ষের ওপর প্রতিষ্ঠিত, হবে, ওসবের বদলে আরও সুন্দর করে কাজ করবার জন্যে প্রতিযোগিতার সম্বন্ধ, সহকর্মিতার সম্বন্ধ এবং যথার্থ ভ্রাতৃ-ভাবের সম্বন্ধ।

পৃথিবী অবশ্যই এমন একটা আদর্শকে গড়ে তুলবার জন্যে এখনও তৈরী হয়ে ওঠেনি। তার কারণ পৃথিবীর লোকেদের এখনও এবস্তুকে বুঝতে পারার এবং গ্রহণ করতে পারার মতন যথেষ্ট জ্ঞান হয়নি, এবং একে বাস্তবে পরিণত করতে গেলে যে সচেতন কর্মশক্তি অপরিহার্য, তাও এখন তার নেই। সেই জন্যেই আমি এর নাম দিয়েছি "স্বপ্ন"।

কিন্তু তথাপি এ স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করেছে, এবং শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে ঠিক এই বস্তুটিই আমরা গড়ে তুলবার চেষ্টা করছি, ক্ষুদ্র আকারে, আমাদের যৎসামান্য সম্বলের অনুপাতে। যতটা গড়ে উঠেছে, পূর্ণতার দিক থেকে তা এখনও বহুদূরে, কিন্তু ক্রমশই সেই দিকে এগিয়ে চলেছে। একটু একটু করে আমরা আমাদের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছি, এবং আশা করি একদিন একে জগতের সামনে ধরে দিতে পারা যাবে, কিভাবে বর্ত-মান মহাবিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য থেকে নিষ্কৃতি লাভ হয় তারই প্রত্যক্ষ কার্যকরী উপায় হিসেবে, যাতে মানুষ জন্মলাভ করতে পারে আরও সত্য এবং আরও সুশৃঙ্খল এক নতুন জীবনে উত্তীর্ণ হয়ে।*

* Bulletin-এ (Aug.'54, Vol. 6. N. 3.) শ্রীমার "Un Rêve"-এর অনুবাদ।

শ্রীঅরবিন্দের একখানি পুরানো পত্র

২৬শে জুন, ১৯১৬

আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে তোমাকে যে সব বাধাবিঘ্ন ভোগ করতে হচ্ছে তা আমাদের সবাইকেই করতে হয়। এ যোগে যতদিন না সমগ্র সত্তা এমন ভাবে গড়ে উঠছে যে, আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতির কোন নিম্নমুখী টান, বা বাইরের বিশৃঙ্খল জগতের কোন প্রভাব, কিম্বা এমন কি যারা এই যোগপথে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত তাদেরও মনোভাব আর আমাদের বিচলিত করতে পারে না, ততদিন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই ফিরে আবার সেই সাধারণ গতিপ্রকৃতির অবস্থায় গিয়ে পড়তে হয়। প্রচলিত সব যোগে মানুষ বিশেষ কোন একটা লক্ষ্যের ওপরই একনজর হয়ে চলে। তাই সেখানে এই ধরণের পশ্চাদ্‌গামী হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু আমাদের এ যোগ এতই জটিল এবং বহুমুখী, আর এর প্রকাণ্ড আয়তনের মধ্যে এত সব বিশাল উদ্দেশ্য স্থান পেয়েছে যে, যতদিন না আমরা কোন একটা প্রচেষ্টায় সিদ্ধির কাছাকাছি এসে পৌঁছচ্ছি, ততদিন বাধাহীন হয়ে এগিয়ে যাওয়ার আশা করতেই পারি না। বিশেষ করে আধ্যাত্মিক জগতে যত শত্রুশক্তি আছে তারা অনুক্ষণ আমাদের বাধা দেবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগে রয়েছে, এবং আমাদের যত লাভের বস্তু কেড়ে নিতে চেষ্টা করছে। এর কারণ এই যে, আমাদের মধ্যে একজনও কেউ যদি পূর্ণসিদ্ধি লাভ করে, তাহলেই তার মানে ওদের রাজ্যে ব্যাপকভাবে পতনের শুরু। বস্তুত বিনা সাহায্যে আমরা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা কোনদিনই এ যোগে সফলকাম হবার আশা করতে পারতাম না। কেবল যে পরিমাণে আমরা ক্রমশ বেশী বেশী একটা বিশ্বজনীন চেতনায় উত্তীর্ণ হয়ে ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারি, সেই পরিমাণেই কতক স্থায়ীভাবে বাধা কাটিয়ে ওঠবার আশা করতে পারি। আমার নিজেরই হয়েছে কতবার এরকম। যে সব অবস্থা সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে আমি তাদের একেবারে নিশ্চিত আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলেছি, সেখান থেকে ফিরে আবার নিচে আগেকার অবস্থায় যেতে হয়েছে; এখন তাই কেবল মোটামুটি তুলনায় এই কথা আমার যোগের কোন একটা অংশের সম্বন্ধে বলতে পারি যে, ওটার সিদ্ধিলাভ হয়েছে। তাহলেও কিন্তু আমি সর্বদা এটা লক্ষ্য করে আসছি যে, যখনই এই ধরণের কোন একটা পুরনো অবস্থা কাটিয়ে উঠেছি, তখনই সঙ্গে সঙ্গেই আধ্যাত্মিক এমন একটা নতুন সাফল্য লাভ করেছি, যেদিকে হয়ত আমার আগেকার সেই আংশিক পরিতৃপ্তির অবস্থা আঁকড়ে ধরে বসে থাকলে, নজরই পড়ত না বা সেটা বাকীই

থেকে যেত। বিশেষ করে আমার যোগপথে এগুবার মানচিত্রটি বহুকাল আগে থেকেই আমার চোখের সামনে ঢকা আছে বলে আমি প্রতি পদে আমার উন্নতির সঠিক পরিমাপ করতে পারি, এবং বিশেষ যে ক্ষতিগুলো হয়েছে সেগুলোর পূরণস্বরূপ, সবজড়িয়ে মোটামুটি যতটা এগুতে পেরেছি সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার চেতনা লাভ করেছি। চরম সিদ্ধি এখনও বহু-দূরে, কিন্তু সামনে অনুক্ষণ এত প্রচণ্ড বিরোধ থাকা সত্ত্বেও কিছুটা উন্নতি যে লাভ করতে পারা গেছে সেটাই হল ভবিষ্যতের পূর্ণসিদ্ধির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেবল তার সময় নির্ধারণের ভারটা আমাদের হাতে নেই, সেটা অন্যত্র। তাই আমি অধৈর্য এবং অসন্তোষকে আমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিই না।

যে শক্তি আমার মধ্যে কর্মরত সে আজ দীর্ঘকাল ধরে অফুরন্ত ধৈর্য ধরে এবং অবিকম্প ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আমার কাছ থেকে সাধনার একেবারে গোড়ার যে বস্তুগুলি দাবী করে আসছে, তা'হল, মনে ও হৃদয়ে একটা অখণ্ড সমতার ভাব, সত্তার সকল অংশে একটা সুনির্মল শুদ্ধি এবং অবিচলিত শক্তির প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য শক্তিদের চেষ্টা হল এই প্রাথমিক শর্তগুলিকে অবহেলা করে সবেগে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু আমার মধ্যেকার শক্তি সে সব প্রচেষ্টাকে বর্জন করে চলেছে। যে ভাবে একজন কারিগর ধৈর্য ধরে তার কাজের যত দোষ ত্রুটি সব সংশোধন করে, ঠিক সেই ভাবে এই শক্তি বারে বারে ফিরে আসার যে গুলো এখনও কাঁচা রয়ে গেছে সেই সব জায়গাতেই এসে কাজ করছে, সেই সব দুর্বল অংশ যেন মেরামত করে করে চলেছে। আমার মতে এরাই হল বাকী আর সবকিছুর ভিত্তি, তাদের অস্তিত্বের হেতু। এগুলি যতবেশী সুদৃঢ় হতে থাকবে, যত বেশী পূর্ণতা লাভ করতে থাকবে, ততই আমাদের আধার আরও নিখুঁত, আরও জীবন্ত ভাবে সকল বস্তু ও সব আধারের মাঝে সেই একনেবাদ্বিতীয়মের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করতে পারবে, সকল রূপে, সব শক্তির মধ্যে, সকল ব্যাপারে, সমগ্র এই পার্থিব চেতনায় এবং তার সকল লীলাখেলায় তা উপলব্ধি করবে। ঐক্যের চেতনা গড়ে ওঠে এই ভাবেই, এবং সেই প্রতিষ্ঠিত চেতনার ওপরই ফুটে ওঠে গভীর পরিতৃপ্তি এবং সেই ঐক্যের ক্রমবর্ধমান আনন্দ। অথচ আমাদের প্রকৃতি হল ঠিক এই বস্তুটির প্রতিই সব চেয়ে বেশী বিমুখ। যত বিভাগ, নিচ্ছেদ, দ্বৈত মনোবৃত্তি, দুঃখভোগ, অতৃপ্ত লালসা ও শ্রম, এই সবের দিকেই তার ঝোঁক, এবং এই সবকেই সে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। দিব্যশক্তির বিশালতা, আনন্দ, শান্ত সমভাব, প্রভৃতি ব্যাপারে নিজেকে অভ্যস্ত করা তার কাছে বড়ই কঠিন বোধ হয়। আর বিশেষ করে আমাদের প্রকৃতির প্রাণগত এবং দেহগত পার্থিব অংশগুলির ত কথাই নেই। এরাই মনকে টেনে নিচে নামায়। মন যখন এই নতুন চেতনার ধারায় সায় দেয়, এমন কি সে যখন দীর্ঘকাল ধরে আনন্দে, শান্তিতে এবং দিব্য ঐক্যের উপলব্ধিতে বাস করছে, তখনও এরা তাকে টেনে নামিয়ে আনে। সেই কারণেই

সোধহয় ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রগুলিতে জীবন ও জাগতিক যত ব্যাপারকে বাতিল করে দেবার দিকে অমন তীব্র ঝোঁক দেখা যায়। ওসবকে জয় করার চেয়ে ওদেরকে ছেড়ে পালানোটাই তারা জীবনের লক্ষ্য বলে স্থির করে। কিন্তু জয় ওসবকে করতেই হবে। ওদের মাঝে যে সব বিদ্রোহী উপাদান রয়েছে, সেগুলোকে উদ্ধার করতে হবে, রূপান্তরিত করতে হবে, বর্জন করলে বা ছেঁটে ফেলে দিলে চলবেনা।

ঐক্য যখন খুব ভাল করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন ত আমাদের অর্ধেকটা কাজই, অর্থাৎ স্থিতির দিকটা শেষ হয়েছে। বাকী থাকে তখন অন্য অর্ধেকটির, অর্থাৎ ক্রিয়ার দিকটি। আর তখনই আমরা সেই "একম্"-এর মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই ঈশ্বরকে এবং তাঁর শক্তিকে, কৃষ্ণকে এবং কালীকে। ভারতীয় ধর্মে উল্লিখিত এই শব্দগুলিই আমি ব্যবহার করেছি এদের নামকরণের জন্যে। যে-শক্তি আমার সমগ্র সত্তাকে এবং আমার প্রকৃতিকে অধিকার করে আছে, সেই হয়ে ওঠে কালী, এখন থেকে সে ও ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। আর যিনি ঈশ্বর তিনি সেই শক্তিকে ব্যবহার করেন, নির্দেশ দেন এবং তাকে—আমার নয়—নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজে লাগিয়ে আনন্দভোগ করেন আমাকে আশ্রয় করে, যাকে আমি বলি স্বয়ং "আমি"। আসলে এ "আমি" হল তাঁরই বিশ্বলীলার কেন্দ্র, এবং তাঁরই খেলায় এ সায় দিচ্ছে, ক্ষুদ্র আত্মা যেমন বিরাট আত্মার আহ্বানে সাড়া দেয়, নিজে তার প্রতিকৃতি ধারণ করে; এইভাবে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ আর কালী ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। সকল পিছুহটা এবং বিপরীত দিকে চলা সত্ত্বেও এই হল আমার এখনকার অবস্থা। অবশ্য এটাকে এখনও বেশ পাকা অবস্থায় পৌঁছেছি বলা চলে না, এবং তীব্রতার দিক থেকেও এটা সম্পূর্ণ নয়। তবে মোটামুটি সাধারণ অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে এটাকে বেশ ভালই অবস্থা বলা চলে। এটা যখন সম্পূর্ণ হবে তখন আমরা আমাদের মধ্যে তাঁর দিব্যজ্ঞানের খেলাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার আশা করতে পারব, এবং সেই জ্ঞান তখন তাঁর দিব্যশক্তির কাজকে পরিচালিত করবে। তারপরের কথা হল তাঁর বিশ্বলীলার বিভিন্ন স্তরের সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন এবং ঊর্ধ্বতর সত্যলোকের নিয়মের ছন্দে এই জড়রাজ্য, আমাদের এই মনদেহ, এবং এই বাহ্য-জগতকে পরিচালিত করা। গোড়ার দিকে আমি অজ্ঞানতার দরুণ, একেবারে প্রাথমিক শর্তগুলি পূরণ না করেই এই সব বস্তুকে তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করতে চাইতাম। সেজন্যে অবশ্যই চেষ্টা করতে হয়েছিল, এবং তার ফলে জড়ের নানাবিধ যন্ত্রও প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে উঠল। কিন্তু এখন সে সবকে আমি অদূরভবিষ্যতের সম্ভাব্য ফলপ্রসূ পূর্ব-অভিজ্ঞতা বলেই দেখি।

অতিমানস সত্তার জ্যোতি এবং শক্তিকে স্থায়ীভাবে অধিকার করাই হল এখন প্রধান উদ্দেশ্য, এবং সমস্ত শক্তি এখন সেই দিকে নিযুক্ত। কিন্তু বিচার বুদ্ধিগত চিন্তার এবং

মনোগত ইচ্ছার যত পুরণো অভ্যাসের অবশিষ্ট অংশগুলো, তাদের টিকে থাকবার অটুট সংকল্প নিয়ে এতবার করে এসে উপস্থিত হচ্ছে যে, তার ক্রমোন্নতির পথে বাধা পড়ছে, অনিশ্চিত ফল হচ্ছে এবং আগে যৎসামান্যও বা লাভ হয়েছিল তাও হারাতে হচ্ছে। এই সব অন্ধ, দীনবুদ্ধি, যন্ত্রচালিতবৎ শক্তিগুলো নিজেদের অনুপযোগিতা স্পষ্ট দেখতে পেয়েও কিন্তু একেবারেই সংশোধন পরাঙ্মুখ। এরা এখন আর আমার মধ্যে নেই। কিন্তু যতবারই বেচারা মন নিজেকে একমাত্র সেই অতিমানসের আলোর দিকে এবং ঊর্ধ্বের আদেশের দিকে খুলে ধরে থাকতে চেষ্টা করে, ততবারই এরা তার চারিদিকে ঝাঁক বেঁধে এসে ভিড় জমিয়ে তোলে, আর তার স্কন্ধে নিজেদের যত মতলব চাপাতে থাকে, যাতে সেই দিব্য জ্ঞান এবং দিব্যইচ্ছাশক্তি মনের মধ্যে অস্পষ্টভাবে, বিকৃত আকারে এবং বেশীর ভাগ সময়ই ভুল নির্দেশ নিয়ে এসে পৌঁছয়। অবশ্য, ব্যাপারটি সবই সময়-সাপেক্ষ; আক্রমণের এই বেগ ক্রমশ নিশ্চয়ই কমে যাবে, এবং শেষ পর্যন্ত তা প্রতিহত হবেই।

সভ্যতা যতদিন আবদ্ধ একটা অকিঞ্চিৎকর সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে ততদিন তার বিপদ, ততদিন নিজের বুকে সে লালন করে এক অজ্ঞানাচ্ছন্ন বিপুল জনতা, এক গণসমূদ্র, এক মজুরশ্রেণী। এর জ্ঞানকে উপর থেকে নেমে ছড়িয়ে পড়তে হবে নতুবা নীচের থেকে অজ্ঞানের রাত্রি যে-কোনো মুহূর্তে উঠে তাকে গ্রাস করে ফেলতে পারে—এ ভয় সর্ব্বদা থাকবে।

(The Human Cycle) —শ্রীঅরবিন্দ

দিব্য-জীবন

[অবতরণিকা]

অনির্বাণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

২৬

বিদ্যার পথে

এইটুকু তাহলে বোঝা গেল, এক অখণ্ড সর্বাবগাহী সম্যকবিজ্ঞানই হল তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ; আর সেই জ্ঞানের দৃষ্টিতে পুরুষার্থের যে-ছবি ফোটে, তাতে ইহলোক লোকান্তর আর লোকোত্তর এই তিনেরই মর্মসত্যের যোজনায় এক সর্বতোভদ্র জীবনের অপরূপ বর্ণ-লৌষম্যের পরিচয় মেলে। এই জীবনই দিব্য জীবন, মর্ত্যের আধারে তাকে সিদ্ধ করাই আমাদের নিয়তি। এবার দেখা যাক, তত্ত্বের সম্যক্‌বিজ্ঞান যার জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সম্যক-দৃষ্টি আমাদের সাধনায় কোন্ ছন্দের প্রবর্তনা আনে।

মাটির মানুষকে ফুটতে হবে চিন্ময়-মানুষ হবে; মৃত্যুর সন্তানকে হতে হবে 'অমৃতস্য পুত্রঃ'—এই তার দিব্য-নিয়তি। এই নিয়তি সিদ্ধ হবে বিদ্যার সাধনায়।

একই অখণ্ড বিদ্যা, কিন্তু তার তিনটি বিভাব—আত্মবিদ্যা, বিশ্ববিদ্যা আর ব্রহ্মবিদ্যা। কিন্তু বিদ্যা বলতে শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য তথ্যের সঞ্চয় ও তত্ত্বের সমাচার বুঝলে চলবেনা, বুঝতে হবে অপরোক্ষ অনুভব।

প্রাকৃত দৃষ্টিতে আমাদের প্রথম জ্ঞানের বিষয় হল দৈনন্দিন জীবনের পরিবেশ—জগতের দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে সবার আগে। তবুও এই জগৎজ্ঞানের মূল প্রেরণা আসছে কিন্তু আত্মভাবনা হতেই—আমি নিজে যা, সেই অনুযায়ী জগৎকে দেখি বা গড়ি। জগতের সঙ্গে নিত্যকার কারবারে আমার আত্মভাবেরই পুষ্টি, আমার আমিকে কেন্দ্র করেই আমার জগৎ। সুতরাং তত্ত্বদৃষ্টিতে জগৎজ্ঞানের চাইতে আত্মজ্ঞানের গুরুত্ব বেশী। আমাকে যদি আমি না জানি, না বুঝি, তাহলে আমার জগতে ছন্দ আনতে পারব না—এ সত্য অনস্বীকার্য।

দেখছি, আত্মপুষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে স্বভাবতই আমাদের বাইরের দৃষ্টি অন্তরের দিকে ফিরে যায়। দুঃখের তাড়নাতেই হ'ক বা জিজ্ঞাসার প্রেরণাতেই হ'ক, প্রকৃতি-সচেতনতার গভীরেই আমাদের মাঝে ফোটে আত্ম-সচেতনতা—বাইরের জগতের যত জটিলতা যত সমস্যা তাদের সমাধানের পথ হয় আত্মপ্রতিষ্ঠার একটি ধ্রুববিন্দুকে আবিষ্কার ক'রে। এই ধ্রুববিন্দু হতেই আসে ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ—যা আনে জগতের প্রশান্তি। যার ব্যক্তিত্ব আছে, জগৎ তার বশ; যার নাই, সে জগতের ক্রীড়নক। আত্মবিদ্যার গুরুত্ব এইখানে।

আত্মবিদ্যার তাগিদে মানুষ অন্তর্মুখ হয়, সে-অন্তর্মুখীনতা একান্তভাবে প্রবল হলে বহির্জগৎ হতে নিজের মধ্যে গুটিয়ে সে তলিয়েও যেতে পারে। অনেকের কাছে আত্ম-বিদ্যার সাধনার চরম লক্ষ্য তাই। কিন্তু আমরা জানি, এ-দৃষ্টি একদেশী—পুরুষার্থের এ-আদর্শ সুস্থও নয়, স্বাভাবিকও নয়। চেতনার কেন্দ্রাভিসারী গতি শক্তির কেন্দ্রাপসারী বিচ্ছুরণের ভূমিকা মাত্র। আত্মবিকাশের জন্যই আত্মসঙ্কোচ প্রয়োজন, তাই জীবনধর্ম। আত্মা অন্নাদ, বিশ্ব তাঁর অন্ন—তাকে আত্মসাৎ করে চিন্ময় করে তোলাই তাঁর প্রাণের তপস্যা। আমাদের আত্মবিদ্যার সাধনাও যদি এই ছন্দের অনুগামী হয়, তাহলে বাইরে-ভিতরে সৌষম্য বজায় থাকে, জীবন অখণ্ড হয়।

একটি অগ্ন্যুৎপাদক যেমন সুপীকৃত ইন্ধনকে অগ্নিময় করে তোলে, তেমনি জড়ের মধ্যে আবির্ভূত চিৎ-কণের তপঃশক্তি বিশ্বকে চিন্ময় করে তুলতে চাইছে—এই প্রেরণা সৃষ্টির মূলে, জীবনের প্রগতির মূলে। এ হল একাত্মতার সাধনা। স্থূলদৃষ্টিতে আগুন আর কাঠ আলাদা; কিন্তু কাঠের মাঝেও আগুন আছে, এমন-কি তার সবখানি আগুন হয়ে উঠতে পারে—এই সম্ভাবনাটাই তার স্বরূপের সত্য। তখন আগুন আর কাঠ একাত্মক। তেমনি জীব আর জগৎও একাত্মক। জীবসত্তাকে সমষ্টিদৃষ্টিতে দেখলে বুঝতে পারি জগৎ জুড়ে তার এই তপস্যা চলছে—বিচিত্র উপায়ে বিশ্বের জড়ে সে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, তাকে চিন্ময় করে তুলছে। জড়ত্বের আড়ষ্টতাকে চিৎশক্তির স্বাচ্ছন্দ্যে মুক্তি দেওয়া—এই হল বৈশ্বানরের অনির্বাণ তপস্যা। এ সাধনা কালের অন্তর্গত, তাই আপাতদৃষ্টিতে তার সিদ্ধির তারতম্য দেখতে পাই। কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখি কালোত্তর নিত্যসিদ্ধির চিদ্‌বিলাস। যা নশ্বর-গতিতে এখানে হচ্ছে, ওখানে তা হয়েই আছে। 'এখানে' 'ওখানে' বলাটাও ভুল, কেননা নিত্যসিদ্ধ আর আপাতসাধ্য দুটি পৃথক তত্ত্ব নয়। নিত্যসিদ্ধিরই আবেশ বীজশক্তি-রূপে সাধ্যের মাঝে উন্মেষের প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ চৈতন্যই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, আর সাধকচৈতন্যই জীব-জগৎ। তিনে কোনও ভেদ নাই। জীব আর জগতের ঈশ্বরাভিমুখী গতিই জীবন। আত্মবিদ্যা বিশ্ববিদ্যা আর ব্রহ্মবিদ্যা—এই ত্রিবিধ বিদ্যার সাধনাই তার অন্তর্গূঢ় মৌল প্রেরণা।

আত্মা বিশ্ব আর ব্রহ্ম—মানুষের সমস্ত জিজ্ঞাসা এই তিনটি তত্ত্বকে ঘিরে। কিন্তু এরা যে এক অদ্বয়তত্ত্বেরই বিভঙ্গ একথা সে সবসময় বুঝে উঠতে পারেনি। তাই সে যেমন পর্যায়ক্রমে তিনটিকে অস্বীকার করেছে, তেমনি আবার কখনও-কখনও তাদের একান্ত করেও তুলেছে। জড়বাদীর কাছে আত্মচৈতন্য অলীক, মায়াবাদীর কাছে জগৎ নাই, নিরীশ্বরবাদীর কাছে ঈশ্বর অসিদ্ধ; আবার তেমনি বিজ্ঞানবাদীর কাছে আত্মচৈতন্যই একমাত্র সত্য, প্রকৃতিবাদীর কাছে বিশ্বজগৎ শক্তির খেলা, নির্বিশেষব্রহ্মবাদীর কাছে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। কিন্তু এ-ধরনের নাস্তিবাদ বা একান্তবাদ কোনটাই সম্যকবিজ্ঞানের অনুকূল নয় এবং মানুষের মুক্ত-চিত্তের জিজ্ঞাসাও এতে পরিতৃপ্ত হয় না। দার্শনিকের কূটতর্ক যাই বলুক, সহজবুদ্ধিতে মানুষ নিজেকে আর জগৎকে না মেনে পারে না— না মানলে তার সংসার চলে না। কিন্তু আমি আর জগৎ এদুটিকে ছাপিয়ে বিরাট আর-একটা কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার না করেও মানুষ পারে না। দৃষ্টির পরিসর ও গভীরতার তারতম্যবশত এই বিরাটের যে-পরিচিতিই দিই না কেন, আমাদের ঈশ্বরভাবনার বীজ কিন্তু এইখানে। জগতের সবটুকু আমি দেখতে পাই না, আমারও আত্মপরিণামের চরম পর্যাটি আমার প্রত্যক্ষ নয়; অর্থাৎ আমার সান্ত আমি আর সান্ত জগৎকে ঘিরে একটা অনন্তের পরিমণ্ডল আছেই। এই আনন্ত্যের সংবেদনই ঈশ্বর-সত্তার প্রমাণ। আমাকে আর জগৎকে না মানলে যেমন সংসার চলে না, তেমনি যে-আকারেই হ'ক এই আনন্ত্যের পটভূমিকাকে স্বীকার না করলেও আমাদের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়।

আমার প্রাণের মাঝে যে বৃহৎ হবার আকূতি রয়েছে তাই জানিয়ে দেয়, ঐ আনন্ত্যের সঙ্গে আমার সত্তার একটা নাড়ীর যোগ আছে, ঐ আমার পরমা নিয়তি। সংসারের ঝামেলা হতে যখন ছুটি চাই, তখন বিকল্পহীন প্রশান্তিরূপে ঐ আনন্ত্য আমার পরমামুক্তির ক্ষেত্র; আবার সংসারে থেকেই তাকে যখন বশ করতে চাই, তখনও তাহতে একটুখানি সরে গিয়ে ঐ আনন্ত্যের ধ্রুব প্রতিষ্ঠা হতেই আত্মশক্তির সহজ বিচ্ছুরণ ঘটাই। সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে কখনও আমরা তাকে বশে আনতে পারি না, তার অঙ্ক আবর্তে নিজেরা পাক খেয়ে মরি শুধু। গাড়ির চাকার সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে, সে চালক হতে পারে না। চালক চক্রা-বর্তনের ঊর্ধ্বে—স্বয়ং নিস্পন্দ থেকেই স্পন্দের প্রবর্তক। বাইরের স্পন্দ অন্তর্মুখে ক্রমসূক্ষ্ম হয়ে অবশেষে কেন্দ্রবিন্দুতে এসে নিস্পন্দ আত্মস্পন্দে রূপান্তরিত হয়েছে। চাকার পরিধিতে একটি বিন্দুর যে-বেগ, কেন্দ্রাভিসারী হলে সে-বেগ ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসবে, এবং শেষপর্যন্ত কেন্দ্রে এসে সে-বেগের পরিমাণ হবে শূন্য। সমগ্রদৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপার এই প্রচণ্ড বেগ এবং অপ্রমেয় স্তব্ধতা দুয়ের সমাহার। তার বেগও সত্য, স্তব্ধতাও সত্য। জড়দৃষ্টিতে বেগ আর স্তব্ধতা পরস্পরের বিরোধী। কিন্তু চিৎদৃষ্টিতে দুয়ের সহভাব

(co-existence) অসম্ভব কিছুই নয়—বরং দেখি তারা অন্যোন্যাশ্রয়ী। নির্গুণে আর সগুণে, চৈতন্যে আর শক্তিতে, ব্রহ্মে আর জগতে তখন প্রাকৃতবুদ্ধির কল্পিত বিরোধের অবসান হয়। 'তিনিই সব হয়েছেন, কিন্তু হয়েও ফুরিয়ে যাননি—পূর্ণ হতে পূর্ণ উপচে পড়ে তবুও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকছে'—নবনীতার এই সহজ অনুভবে তখন বিশ্ব আর বিশ্বোত্তরের অন্যোন্যাসম্বন্ধের স্বরূপ ধরা পড়ে। ব্রহ্মের এই অনির্বচনীয় জগদ্‌ভাবের নির্বচন হয় তখন আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তিতে, তুঙ্গতায় ও গভীরতায়, তার শক্তির নিত্য বিচ্ছুরণে। এমনি করে আত্মবিদ্যা, বিশ্ববিদ্যা আর ব্রহ্মবিদ্যার পরম সমন্বয়ে জীবনে নিদ্যার সাধনায় আসে সর্বগ্রাহী অখণ্ড পূর্ণতা।

কিন্তু এই সমাকজ্ঞান মানুষের চেতনায় ফোটে পরিণামের অনেক ধাপ পার হয়ে। তার উদ্যোগপর্বে মানুষের সাধনার বিষয় হল তার ব্যক্তিসত্তার প্রতিষ্ঠা। এইজন্য প্রথম তাকে ব্যস্ত থাকতে হয় নিজের অহংকে নিয়ে। যে-আত্মভাব একদিন ব্রহ্মাত্মভাবে এবং সর্বাত্মভাবে চেতনায় প্রথম হয়ে উঠবে, তার প্রথম স্ফুলিঙ্গটি দেখা দেয় মানুষের এই অহং-এর উপাসনায়। অহংকে আশ্রয় করেই সে প্রকৃতির অচেতন ও অবচেতন অন্ধশক্তির পাশ হতে সবলে নিজেকে ছিনিয়ে নিতে পারে। অহন্তার উন্মেষ তার পরিপূর্ণ আত্মোন্মেষের প্রথম পর্ব। সত্য বটে, 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল'—কিন্তু তাকে গলা টিপে মারলে তো চলবেনা; তার মরণ হবে, আলোর মরণ—সূর্যের আলোতে নক্ষত্রের ঝিকিমিকি যেমন ক'রে মরে, তেমনি মরণ। সে-মরণ সঙ্কোচ নয়, সহজ আনন্দময় বিস্ফারণ; তাতে আত্মপ্রকৃতির চিন্ময় আপ্যায়ন ঘটে বলে তা জীবনধর্মেরই অনুগামী।

আত্মপ্রসারণের প্রথম পর্বে অহন্তার আশ্রয় হয় যূথ-সংস্কার (herd-instinct), সমাজ-চেতনা বা গণচেতনা। এই গণচেতনার উৎস রয়েছে অধিচেতনার ভূমিতে, অচিতির পরে অন্তর্নিহিত বিশ্ব-চেতনার নিগূঢ় চাপে তার সৃষ্টি। বাইরের দৃষ্টিতে গণচেতনা আকারপ্রকারহীন হলেও, অধিচেতন দৃষ্টিতে তার ভাবময় বিপুল রূপায়ণ অত্যন্ত বাস্তব। প্রকাশ ও প্রগতির পানে একটা নিঃশব্দ আকূতি সর্বদা সে বহন করে চলেছে, কিন্তু অবচেতনার আঁধার পথে তার চলাফেরা বলে দিনের আলোয় নিজের ভাবরূপকে স্পষ্ট করে তুলতে তার দরকার হয় ব্যক্তি-চিত্তের প্রেষণা।

ব্যক্তি-চিত্ত আর গণ-চিত্ত অন্যোন্যাশ্রয়ী। প্রথমটা দেখি ব্যক্তি-চিত্তের আশ্রয় হল গণ-চিত্ত। মানুষ সামাজিক জীব, গণ-চিত্তের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়েই সে জন্মায়, তারই সক্রিয় প্রভাবে আত্মচেতনাকে সে বিকসিত করে। গণ-চিত্তের গর্ভাশয়ে সে যেন

প্রবণের মত। কিন্তু এমনি করে গণ-চিত্তের একান্ত আশ্রিত হলেও ব্যক্তি-চিত্তে এমন-একটা সময় আসে যখন সে গণ-চিত্তের গতানুগতিকতাকে ছাড়িয়ে উঠতে চায়। সব ব্যক্তিই যে চায় তা নয়,—কিন্তু বিশ্বচেতনার নিগূঢ় প্রেরণায় কেউ-না-কেউ চায়। সে চায়, সে বিপ্লবী—গণ-চেতনায় অন্তর্নিহিত প্রগতির অস্ফুট আকূতিকে সে-ই রূপ দেয়। ব্যক্তির অন্তরে আগে বিপ্লবের আগুন না জ্বলে উঠলে গণ-চেতনায় তার তাপ সঞ্চারিত হয় না। গণপতিহীন গণবিপ্লব একটা ফাঁকা কথা। আবার এইখানেই গণ-চিত্ত ব্যক্তি-চিত্তের একান্ত আশ্রিত; গণপতিত্বেই ব্যক্তির সার্থকতা, 'বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ' নিজেকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তার অহন্তার শিবময় পরিতর্পণ। ব্যক্তিত্বের মর্যাদা এইখানেই—সমূঢ় গণ-চেতনার সে জ্যোতির্ময় দিশারী। মহাপ্রকৃতি শুধু গণ-জননী নন, তিনি গণেশ-জননী—তাতেই তাঁর জননীত্বের চিদ্‌ঘন রূপায়ণ। গণবাহিনী যদি দেবসেনাও হয়, তবুও দেবসেনা-পতি কুমারের নায়কত্ব অপরিহার্য—নইলে অসুরের বিরুদ্ধে বিপ্লবের অভিযান চলে না। গণমহিমাকে ফাঁপিয়ে তুলতে গিয়ে আধুনিক বিপ্লববাদী এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট সোজা সত্যটা অনেক সময় ভুলে যান।

বস্তুত গণ-চিত্তে আজও যা অস্ফুট তাকে স্ফুটরূপে জাগিয়ে তোলা ব্যক্তিরই একক তপস্যার দায়। এইজন্য নিজেকে পেতে বারবার তাকে গুটিয়ে যেতে হয়েছে নিজের মধ্যে; 'চারিদিক হতে অসুর জীবন বিন্দু-বিন্দু করি আহরণ' আপনার মাঝে আপনাকে পূর্ণ দেখে তবে সে 'অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়' মন্ত্রে নতুন সৃষ্টির ব্যাহৃতি উচ্চারণের অধিকার পেয়েছে। বলিষ্ঠ প্রাণ মন ও চেতনা নিয়ে মহারথী সমাজপতির আবির্ভাব ঘটেছে যে-সমাজে, সেই-খানেই মানুষের পক্ষে প্রগতির পথ হয়েছে নির্বাধ। গণপতির উদার ক্রান্তদর্শী আত্মসংবিতে দেখি বিশ্বাত্মভাবে ব্যক্তির অহন্তার সম্প্রসারণের প্রথম সূচনা।

তবুও বলব, ব্যক্তির অহংপ্রতিষ্ঠাই কখনও আত্মজ্ঞান হতে পারে না। দেহের অহং প্রাণের অহং বা মনের অহংকে যতই ফাঁপিয়ে তুলি না কেন—এমন-কি এই ভিত্তিতে শোষণ-হীন গণতন্ত্রী সমাজও যদি গড়ে তুলি, তাহলেও প্রগতির শেষ পর্বে এসে পৌঁছেছি এমন কথা আমরা বলতে পারব না। 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ', 'ন বিত্তেনামৃতস্য আশা অস্তি'—ভোগৈশ্বর্যের বিপুল উপকরণ সঞ্চয় করে সবার মাঝে সমান ভাবে তা বেঁটে দিয়েও মানুষের অন্তরকে আমরা তৃপ্ত করতে পারব না। প্রকৃতির নিয়মেই এমন একদিন আসবে, যেদিন তার আনন্দ ইন্দ্রিয়নির্ভর না হয়ে হবে মনোনির্ভর, বুদ্ধিনির্ভর এবং অবশেষে আত্মনির্ভর। যেমন জ্ঞানে, তেমনি ভোগে—বিষয় আর বিষয়ীর তাদাত্ম্যবোধই হল বিষয়সংযোগের চরম নিয়তি। সব জানাতেই আমি আমাকেই জানছি, সব সম্ভোগেই আমি আমাকেই সম্ভোগ করছি—এই একরস আত্মার বোধই সমস্ত জ্ঞান ও ভোগের বীজ এবং পর্যবসান। তাই

মানুষের বহিশ্চর ব্যক্তিসত্তার পিছনে রয়েছে যে অন্তর্পুরুষ পৌরুষের সত্তার বাসনা, তার বহি-মাকে আবিষ্কার করবার আহ্বান একদিন তার জীবনে আসেই। ইন্দ্রিয়ের বা মনের জগৎ তখন উড়ে যায় না, কিন্তু তাদের বর্ণচর চিন্ময় অর্থটি চেতনায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মানুষের আত্ম-আবিষ্কারে এমনি করে বিশ্ব এবং বিশ্বাতীতের রহস্যও তার কাছে অনাবৃত হয়ে পড়ে।

অবিদ্যার নাগপাশ খসিয়ে মানুষ যখন নিজেকে কালাতীত চিন্ময় শাশ্বত পরিতোষাপ্ত আত্মস্বরূপ বলে জানে, তখন এই আত্মবিদ্যাই তাকে দেয় বিশ্ববিদ্যারও অধিকার। বিশ্ব-বিদ্যা শুধু জড় প্রাণ বা মনের বিজ্ঞান নয়, কেননা বিশ্ব তো শুধু এই ক'টি উপাদানেই গড়া নয়। আমার মাঝে যা আছে তাই আছে বিশ্বেও—'যা আছে ভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। আমার আধারের গভীরে দেহ-প্রাণ-মনেরও পরে যেমন আছে বিজ্ঞানঘন আনন্দ-চিন্ময় পৌ-রুষের সত্তার সত্তা, তেমনি এই জড়বিশ্বের মৃন্ময়-দেহেও আছেন এক অন্তর্যামী আনন্দ-চিন্ময় দেবী। আমার মাঝে যিনি আছেন, তিনিই রয়েছেন এই বিশ্বেও—'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা।' অহংএর কুণ্ডলীতে গুটিয়ে থাকি যতক্ষণ, ততক্ষণ সবার মাঝে আমাকে খুঁজে পাই না। কিন্তু নিজের গভীরে ডুবে আমার আত্মস্বরূপকে যখন আবিষ্কার করি, তখন এক স্বচ্ছ নির্বোধ নির্মুক্ত আত্মাববোধের আনন্দ অনিবার্য বৈপুল্যে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে—সবাই তখন আমার আপন, সবই আমি: আরও উদারভাবে বলতে গেলে আমাতে-তোমাতে সব-কিছুই শুধু এক আত্মা, এক বিশ্বাত্মার হৃৎস্পন্দনেই ভূতাত্মা স্পন্দিত।

বিশ্বের মাঝে বিশ্বাতীতের এই হৃৎস্পন্দনের অস্পষ্ট অনুভব হতেই ধর্মবোধের শুরু। তথাকথিত অসভ্যেরা বিশ্বকে প্রাণ-চিন্ময় দেখে, বিশ্বাস করে জলে স্থলে অন্তরিক্ষে জড়ে জীবে দেবতা আছেন সব ঠাঁই; আমরা বুদ্ধিগর্বিত সভ্যেরা তা শুনে অন্ধ কুসংস্কার বলে নাক সিঁটকাই। কিন্তু একথা বুঝিনা, আদিমানবের ঐ প্রাণ-চিন্ময় বোধ আর পরমবিজ্ঞানীর সর্বব্রহ্মময় বোধ দুয়ের মাঝে আছার একই আকুতির পরিতর্প —শুধু একটিতে তার রূপ স্পষ্ট, আর একটিতে অস্পষ্ট। আমাদের বুদ্ধিগর্বিত যৌবনের অহঙ্কারের মতই জীবনায়নের একটা মধ্য পর্বমাত্র; তার সার্থক পরিণাম ঘটে যখন প্রাক্তদশায় আবার শৈশবের সারল্যে ফিরে যাই। অধ্যাত্মরাজ্যেও তাই; আমার মাঝে দেবতাকে খুঁজতে গিয়ে বাইরে তাঁকে হারাই, কিন্তু আবার যখন আদিমানবের সরল হৃদয় দিয়ে বাইরেও তাঁকে পাই, তখনই তাঁকে পাওয়া ঐশ্বর্য আর মাধুর্যের দ্বৈতবিলাসে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

বস্তুত ব্রহ্মকে পাওয়া অন্তরের গভীর গহনে, আবার তাঁকে পাওয়া বাইরের বিপুল বৈচিত্র্যে—এমনি করে আত্মবিদ্যা এবং বিশ্ববিদ্যাতে ব্রহ্মবিদ্যার সমাবেশে বিদ্যার যে

ত্রিবেণীসঙ্গম, তাই জীবের পরম পুরুষার্থসিদ্ধির মহাতীর্থ। আমাকেও জানব, জগৎকেও জানব—কিন্তু জানব বৃহৎ করে। বৃহৎ করে জানবার জন্যই আগে নিজের মধ্যে গুটিয়ে যেতে হয়, তলিয়ে যেতে হয় প্রাকৃত বহিশ্চর সত্তার গভীরে। যখন আমার মাঝে সত্য আত্মাকে খুঁজে পাই, তখন দেখি বিশ্ব জুড়ে বিচিত্র পরিণামের পরম্পরায় সেই এক অনির্বচনীয় স্ফুরণ। সে-আমি আর জীব নয়, 'শব—অহং নয়, ব্রহ্ম। তাকে আমি না বলে বলি আত্মা, বলি 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'সর্বম্ আত্মৈবাভূৎ।' জীব জগৎ আর ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই—এই অদ্বৈতজ্ঞানই সম্যক্ বিজ্ঞান, বিদ্যার সাধনায় এই হল পরমা সিদ্ধি।

২৭

উত্তরায়ণের রীতি

বিশ্ব জুড়ে তাহলে চলছে একটা বিদ্যার তপস্যা। জীবে-জীবে নিহিত যে চিন্নীজ, তাই অঙ্কুরিত পল্লবিত পুষ্পিত হয়ে বনস্পতির মহিমায় নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে, এই হল জীবনের তাৎপর্য। সমস্ত জগদ্ব্যাপার অন্নময় অচিৎ হতে প্রকৃতির চিন্ময় পরিণামের খেলা, অর্থাৎ এখানে জড়কে আধার করেই চিৎস্বরূপ পর্বে-পর্বে আপনাকে রূপায়িত করে চলেছেন। এই চিন্ময় রূপায়ণই আমাদের জীবনসত্য।

এননিতর প্রকৃতি-পরিণামের মধ্যে রয়েছে একটা ত্রিপর্বা প্রগতির ছন্দ। প্রথমত জড়ের পরিণামের ফলে জীবাধারে দেখা দেয় নানা সূক্ষ্ম জটিলতা, যাতে চেতনার বিচিত্র উন্মেষকে স্বচ্ছন্দে সে বহন করতে পারে; তারপর একটা ঊর্ধ্বতর ভূমি লক্ষ্য করে চলে চেতনার আয়াসসাধ্য উদয়ন এবং অবশেষে ঊর্ধ্বভূমির আশ্রয় পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অবরভূমিকেও আত্মসাৎ করে তার রূপান্তর ঘটানো। উত্তরায়ণের এই তিনটি পর্বের সমান্তরালে দেখা দেয় পরিণামেরও তিনটি বৈশিষ্ট্য: প্রথমে অচিতির মাঝে চলে প্রকৃতির আচ্ছন্ন সম্মুখ যান্ত্রিক পরিণাম, তারপর চিতিশক্তির ক্রমিক উন্মেষে অবিদ্যা হয় প্রকৃতি-পরিণামের নিয়ামক, এবং অবশেষে বিদ্যাশক্তির পরিপূর্ণ উন্মেষে ঘটে আধারের চিন্ময় পরিণাম। মোটের উপর, প্রথমত আধার তৈরি করা, তারপর সেই আধারে নিজেকে ফোটাবার জন্য একটা কৃচ্ছ্র সাধনা এবং অবশেষে ঊর্ধ্বশক্তির উন্মেষে অবাধে নিজেকে ফুটিয়ে চলা—এই হল প্রকৃতি-পরিণামের ধারা।

উত্তরায়ণের এই সামান্য রীতি ছাড়া আর-একটা রীতি হল ঊর্ধ্বশক্তি এবং অবরশক্তির অন্যোন্যসংক্রমণ। ঊর্ধ্বশক্তিকে ফুটতে হয় অবরশক্তির বাধা ঠেলে। পরিণামের

মধ্যপর্বে তাই একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, আর তখন ঊর্ধ্বশক্তি যেমন অবরশক্তিকে প্রভাবিত করে অবরশক্তিও তেমনি ঊর্ধ্বশক্তিকে প্রভাবিত করতে চাহেনা। জড়ের মধ্যে চিৎ ফুটতে গিয়ে জড়কে যেমন উদ্বুদ্ধ করে তোলে, তেমনি জড়ের আচ্ছন্নভাবও তাকে খানিকটা স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু এই মনোনাসংক্রমণ পরিণামের মধ্যপর্বেরই একটা ব্যাপার। মৃন্ময়ী প্রকৃতি হবে চিন্ময়ী—এই হল বিশ্বব্যাপারের গোড়ার কথা। সুতরাং জড় চিৎপ্রকাশের আধার হলেও জড় নয়—চৈতন্যই হল বিশ্বের মৌলশক্তি। জড়ের বাধা কাটিয়ে উঠতে চৈতন্যকে প্রথমত খানিকটা জড়ধর্মাক্রান্ত হতে হলেও শেষপর্যন্ত জড়কে সম্পূর্ণই সে চিন্ময় করে তুলবে—এই হল প্রকৃতি-পরিণামের দিব্য নিয়তি। কাঠে আগুন ঘুমিয়ে আছে; কাঠে-কাঠে ঘষা লেগেই হ'ক বা বাইরের আগুনের ছোঁয়া পেয়েই হ'ক, ঘুমন্ত আগুন যখন জেগে ওঠে, তখন প্রথমে খানিকটা ধোঁয়ার সৃষ্টি করে, যাতে তাপ থাকলেও আলো নাই; কিন্তু শেষপর্যন্ত কাঠটা পুরোপুরি জ্বলে উঠলে তাপ আর আলো ছাড়া তার মধ্যে আর কিছুই থাকে না।

জড় হতে চেতনার এই উত্তরায়ণে স্বভাবতই বাইরের দৃষ্টিতে কতকগুলি পর্বভেদ দেখা দেয়। প্রকৃতিপরিণামের গোড়ার ভিত্তি হল জড়, তারপর দেখা দিল উদ্ভিদ, পশু, পশুপ্রায় মানুষ, পুরো মানুষ, অবশেষে চিন্ময়-সত্ত্বের (spiritual beings) নানা পর্যায়। অবশ্য এই পর্বগুলি ছ'কে নিয়েছে আমাদের প্রাকৃতবুদ্ধি—বস্তুর বাহ্যিক আকৃতি আর ব্যবহার দিয়ে কতকগুলি জাতিরূপের (type) কল্পনা ক'রে। তাই প্রশ্ন ওঠে, এই পর্বগুলির মাঝে রূপায়ণের একটা অবিচ্ছেদ অনুবৃত্তি (continuity) রয়েছে, না মাঝে-মাঝে ফাঁক দেখা দিয়ে একটা পর্বকে আর-একটা পর্ব থেকে আলাদা করে দিয়েছে? বৈজ্ঞানিক প্রশ্নটার মীমাংসা করতে চান বাইরে থেকে—আকৃতি-পরিণামের একটা পরম্পরিত ইতিহাস গড়ে তোলবার চেষ্টা ক'রে। তাই দুটি পর্বের মাঝে হারানো পর্বসন্ধি (missing links) খুঁজে বেড়ানো তাঁর একটা কাজ। কিন্তু চৈতন্যকেই যদি বিশ্বের মূলতত্ত্ব বলে ধরি, তাহলে প্রশ্নটা বিচার করতে হবে বাহ্যিক আকৃতি-পরিণামের দিক থেকে নয়, আন্তর চিৎ-পরিণামের দিক থেকে। তাহলে পর্বভেদ আর অনুবৃত্তি দুয়েরই রহস্য সহজে বোঝা যায়। বস্তুত প্রকৃতি-পরিণামের মাঝে পর্বভেদ আর অনুবৃত্তি দুটো ধারাই চলছে—তার মধ্যে পর্বভেদ দেখা দেয় বাইরের দৃষ্টিতে, আর অনুবৃত্তি আন্তর দৃষ্টিতে। পরিণামকে যখন বাইরে রেখে দেখি, তখন মনে হয় তা যেন লম্বকে-লম্বকে চলেছে। এ-দেখাটা আমাদের মনের ধরণ, মন ভাগ-ভাগ করে না দেখলে কিছুই বুঝতে পারে না। আবার এমনিতর ভাগ-ভাগ করে দেখার একটা ব্যাবহারিক সার্থকতাও আছে। একটা নতুন জাতিরূপ সৃষ্টি হলে পর তার চার দিকে সীমার গণ্ডি দিতেই হয়, নইলে তার স্বকীয়তা বজায় থাকে না, যে নতুন পরিণাম

সিদ্ধ হল তা আমার পিছিয়ে যাবার একটা আশঙ্কা থাকে। তাই এককে বিভক্তভাবে দেখা, বিভক্তভাবে ব্যবহার করার একটা প্রয়োজন আছে—যেমন আছে চিৎ-পরিণামের আদিপর্বে আমাদের অহন্তার পুষ্টির। প্রকৃতি যেন এক পায়ের পর এক পা ফেলে এগিয়ে চলছে—পিছনের পায়ের উপর নিশ্চিত নির্ভর পেয়ে তবে সে সামনের পা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এখানে তার গতি দেখছি লম্ফে-লম্ফে; কিন্তু সব মিলিয়ে গতিটা কিন্তু একটানা একটা প্রবাহ। পদক্ষেপ কোথায় দীর্ঘ-হ্রস্ব করতে হবে, তা নির্ভর করছে তার ভিতরের অখণ্ড ইচ্ছার প্রবাহের 'পরে। প্রকৃতি-পরিণামের বেলায় পর্বভেদ আর অনুবৃত্তির যুগলতত্ত্বেরও এই রীতি। পর্ব-পরম্পরার মাঝে আমরা যে কার্যকারণের শৃঙ্খল রচনা করছি, সেটা ব্যাবহারিক দৃষ্টির গরজে। আসলে অন্তরের চিৎ-শক্তির প্রেষণাতেই একটা পর্বের পর একটা পর্ব ফুটছে এবং পরিণামের ঊর্ধ্বপর্বে পর্বে-পর্বে ব্যবধানটা গভীরতর হয়ে দেখা দিচ্ছে শুধু সংক্রমণ (transition) নয়, রূপান্তর (transformation)। বাইরের দৃষ্টিতে রূপান্তরকে মনে হয়, যেন পর্বচ্ছেদ; কিন্তু আন্তরদৃষ্টিতে তা চিৎ-শক্তিরই উল্লাস—ওতে চিৎ-পরিণামের বেগ বেড়েছে, কিন্তু বেড়েছে অবিচ্ছেদে। প্রদীপের সলতে উস্কে দিলে আলোর জোর হয় এবং দৃশ্যের নতুন-নতুন ঐশ্বর্য ফুটে ওঠে, কিন্তু আলোর মাঝে পুরাশের ধারাটা অব্যাহতই থাকে।

প্রকৃতি-পরিণামের মাঝে পর্বভেদের কারণ তাই পরিণামেরই অন্তর্গূঢ় চিৎ-শক্তির প্রবর্তনাতে, বাহ্যিক আকৃতি-পরিণামের ধারাতে নয়। সবটার মাঝে চলছে চেতনার উত্তরায়ণের একটা অভিযান। তার মধ্যে চিৎ-শক্তি প্রথমটায় ধীরে-ধীরে বেগ সঞ্চয় করে চলে, তারপর হঠাৎ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে নীচের ভূমিগুলোকে নিজের মাঝে টেনে তুলে আত্মসাৎ করে। মোটামুটি এই হল উত্তরায়ণের রীতি।

এই রীতিতে প্রকৃতি-পরিণামের প্রথম পর্বে জড়ের মধ্যে ফুটল প্রাণ, যার আদিরূপের আমরা মোটামুটি নাম দিতে পারি উদ্ভিদ। উদ্ভিদের মাঝে প্রাণের ক্রিয়া পরিস্ফুট এবং বেশ জোরালো, কিন্তু মনের ক্রিয়া আচ্ছন্ন। যদি চেতনার নিরিখ দিয়ে বিচার করি তাহলে বলতে পারি, উদ্ভিদে প্রাণশক্তি অবচেতন। তার নীচের ভূমিতে জড়ে এই শক্তি অন্তশ্চেতন এবং উপরের ভূমি পশুতে সচেতন। এক্ষেত্রে চেতনার মৌল লক্ষণ হল বিষয়ের বোধ; এই বোধে সত্তা বিষয়ী (subject) আর বিষয় (object) ভাগ হয়ে পড়ল। খুব কাছাকাছি একটা উপমা হল, আমাদের ঘুম থেকে যেমন জেগে ওঠা। ঘুমের মধ্যে বিষয়-বিষয়ী একাকার, অথচ আমরা অন্তশ্চেতন, যদিও বাইরের দৃষ্টিতে নিশ্চেতন; স্বপ্নে আমরা আচ্ছন্নচেতন বা অবচেতন, জাগ্রতে চেতন। প্রকৃতি পশুর মধ্যে যেন প্রথম জেগে উঠে দেখতে পেল বাইরের একটা জগৎ। চেতনার দ্রষ্টৃত্বের সঙ্গে-সঙ্গে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটল আর দুটি বৃত্তি, সচেতন কর্তৃত্ব আর ভোক্তৃত্ব; জাগল ইচ্ছা, জাগল বুভুক্ষা, জাগল

জিজ্ঞাসা। উপনিষদের ভাষায় বিশ্বসত্তা অন্ন আর অন্নাদে ভাগ হয়ে পড়ল : অন্ন জড়, অন্নাদ প্রাণচেতনা . জড় প্রাণাগ্নির ইন্ধন। তারপর থেকে জিজ্ঞাসার প্রেরণায় চলল দৃশ্য জগতের আবিষ্করণ, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে বুভুক্ষার তাড়নায় তার আত্তীকরণ (assimilation)। বাইরের জগতের বৈচিত্র্যের আবিষ্কারে বাহ্যচেতনা যেমন সমৃদ্ধ হয়ে চলল, তেমনি অন্তশ্চেতনাও পুষ্ট হয়ে জাগাল আত্মসংবিৎ। পশু হতে জীবনের উন্নীত হল মানুষের পর্যায়ে। মানুষের মাঝে অতীতের সব-কিছুর সমাহারের ভিত্তিতে দেখা দিল চিৎপরিণামের একটা নতুন পর্বের ইশারা।

পার্থিব-প্রকৃতির মাঝে আপাতত মানুষেরই মাঝে দেখছি চেতনার চরম উন্মেষ। বিষয় থেকে বিষয়ীকে বিবিক্ত করে নিয়ে সচেতনতার যে প্রথম প্রস্ফুরণ, মানুষের আত্ম-সচেতনতায় তারই পরম উৎকর্ষ ঘটল সাক্ষিচেতনার মর্মভেদী দৃষ্টিতে—যা যুগপৎ নিশ্চাত হল অন্তরের অন্তস্তলে, বিশ্বের মর্মগহনে এবং বিশ্বোত্তরের নিঃসীম দিগন্তে। কিন্তু এই উদ্বুদ্ধ উদার ও গভীর দৃষ্টি মানুষের মাঝে একদিনে ফোটেনি, তার জন্য মনশ্চেতনার বিভিন্ন-ভূমি তাকে পার হয়ে আসতে হয়েছে। মানুষ মূলত মনোময়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে আজও সে 'প্রাণশরীরনেতা মনোময় পুরুষ নয়। প্রাকৃত মানুষ আজ যেখানে নিরাপদ প্রতিষ্ঠার আসন পেতেছে, তাকে বলতে পারি অন্নমনোময় ভূমি। মোটের উপর প্রাকৃত মানুষ জড়-নির্ভর, জড়াসক্ত—অন্নময় স্থূল মস্তিষ্ক, স্থূল ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-মানসকে আশ্রয় করেই চলে তার চিন্তা এবং ব্যবহার। অথচ এই জড়াসক্ত মানুষেরও একটা প্রাণময় ও একটা মনোময় কোশ আছে—যদিও তারা নিতান্তই জড়াশ্রয়ী। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মানুষের এই জড়া-সক্তি প্রকৃতিপরিণামের একটা সযুযোজন আদিপর্ব, কেননা জীবনের এই জড়ময় ভিত্তির 'পরেই নির্ভর করছে প্রকৃতির উত্তরসাধনার নিরাপত্তা। তবু ও বলব, জড় আদি হলেও সেই যে মানুষের ঊর্ধ্বপরিণামের নিয়ামক একথা কিন্তু সত্য নয়। প্রাকৃত চেতনা জড়াশ্রয়ী হলেও জড়ত্বকে ছাড়িয়ে যাবার নিরন্তর তপস্যাই তার ধর্ম। জড়ের মাঝে চিদ্‌গুণের উত্তরো-ত্তর স্ফুরণই প্রকৃতি-পরিণামের তাৎপর্য এবং এই উৎকর্ষণের নিরিখেই জড় ও চৈতন্যের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে একথা ভুললে চলবে না।

জড়াসক্ত মনকে ছাড়িয়ে স্থূল ইন্দ্রিয়-সংবিতের আরও গভীরে আছে প্রাণাধার প্রজ্ঞা। অবিচেতন ভূমিতে অন্তর্লুপ্ত হয়ে আছেন যে প্রাণ-পুরুষ তিনিই তার ভর্তা। প্রাকৃতভূমিতে প্রাণাত্মবাদী মানুষের আধার গড়ে ওঠে এই সূক্ষ্ম প্রাণলোকেরই শক্তিসন্নিপাতে। সে বিদ্রোহী, সীমার বাঁধন ছিঁড়ে নবীন দিগন্তের এষণায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মহাশূন্যের বুকে—কল্পলোকের সে হয় নূতন পথিকৃৎ। এই প্রাণাত্মিকা মন চরিষ্ণু বলে প্রকৃতিপরিণামের সে একটা শক্তিশালী সাধন।

প্রাণময়-মনের উপরে অথচ তার চাইতে গভীর স্তরে প্রসারিত রয়েছে একটা শুদ্ধ ভাবনার স্তর—যাকে বলতে পারি যথার্থ মনোময় ভূমি। এই মনোভূমির শক্তিতে আবিষ্ট যারা তারাই হয় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী, বাণীর সাধক, ভবিষ্যযুগের স্বপ্নপাগল। আজপর্যন্ত এই হল মনোময় জীবের প্রগতির সীমা। এরই মাঝে যারা অন্তরাবৃত্ত এবং অতি-মাত্রায় আত্মসচেতন, তারা এই মনোভূমির ঊর্ধ্বে এবং গভীরে আবিষ্কার করে একটা শুদ্ধ-বুদ্ধির জগৎ, যেখানে থেকে মন-প্রাণের সাক্ষী হয়ে প্রজ্ঞানের আলোকে তাদের নিয়ন্ত্রণ কর-বার অধিকার তারা পায়। বলতে গেলে জড়নিরপেক্ষ যথার্থ অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ শুরু হয় এইখান থেকে।

এই শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত মনের পিছনে আছে আমাদের অধিচেতন মন—মনোভূমির সকল বস্তুই যার অপরোক্ষ-জ্ঞানের বিষয়। এই অধিচেতন ভূমিতে এলে প্রাকৃত জগতে দেহে বাস করার মত সচেতনভাবে মনে বাস করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না। বলতে গেলে প্রকৃতির আরোহক্রমে এই আমাদের চরম স্থিতি; এরপর বাকী থাকে শুধু প্রকৃতির চিন্ময় পরিণাম।

আমাদের বহিশ্চর চেতনার ভূমিতেই প্রকৃতি মনোময় প্রাণময় ও অন্নময় মানুষকে গড়ে এসেছে এতকাল। তারা অনেক তোলাপাড়া ঘটিয়েছে পার্থিব জীবনে, মানুষকে পশুর পর্যায় থেকে টেনে তুলেছে মনুষ্যত্বের বর্তমান ভূমিতে। তাদের ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে নিষ্পেষ-কল্পিত অতিকায় মানবত্বে আমরা পৌঁছতে পারি বটে, কিন্তু তাতে মনুষ্যজীবনের অতিস্ফীতিই ঘটবে শুধু—আনবে রূপান্তর যারা তাকে দেবতা করে তোলা যাবে না কোন মতেই। অথচ চিন্ময় মানবের সৃষ্টিই বলতে গেলে মনুষ্যসৃষ্টির চরম চমৎকার—তার আবি-র্ভাবকে লক্ষ্য করেই চলছে প্রকৃতির নিগূঢ় তপস্যা। আমাদের এই প্রাকৃত আধারেই আছে এক অন্তর্গূঢ় জীবসত্য—যা যুগপৎ লোকোত্তরের পানে এবং আমাদেরই অন্তর-গহনের পানে নিজেকে করতে পারে উন্মীলিত। এই উভয়তোমুখ উন্মীলনই হল প্রকৃতির নব-পরিণামের মর্মরহস্য।

চিন্ময় মানুষই জগতে বয়ে এনেছে এই নব-পরিণামের সূচনা। কিন্তু শক্তি-পরিণামের অতীত ধারা হতে বর্তমান ধারা দুটি বিষয়ে পৃথক। প্রথমত এর মূলে আছে মনুষ্যচিত্তের সচেতন প্রবর্তনা—যা-কিছু ঘটছে তার জাগ্রত দৃষ্টির সম্মুখে, তার ইচ্ছার স্বীকৃতি নিয়েই ঘটছে; দ্বিতীয়ত, এ-পরিণামের সাধনা শুধু বহিঃপ্রকৃতির সচেতন প্রগতিতেই পর্যবসিত হয়নি,—এর মাঝে আছে যুগপৎ অন্তরের গভীরে ডোববার বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বার এবং বিশ্বকে ছাপিয়ে যাবার একটা সংবর্তুল প্রয়াস। অর্থাৎ চিৎ-পরিণাম শুধু চেতনার সীমার প্রসারণ নয়, এক ভূমি হতে আর-এক ভূমিতে উত্তরণের ফলে তার সম্যক্ রূপান্তর। কিন্তু একথাও

সত্তা, জড়ের আধারকণা এখনও খোলা হয়ে রেখে আছে মানুষের চিত্তের 'পরে, সুতরাং সমগ্র মানবজাতিই যে মনোময় জীব হতে চিন্ময় জীবে রূপান্তরিত হবে—তা সম্ভবও নয়, আবশ্যকও নয়। কিন্তু দেবকর্মের আদর্শকে সাধারণভাবে সবাই স্বীকার করবে এবং তার সাধনা শুরু করে দেবে, চিত্তের তীব্র এষণাকে মানুষ সচেতনভাবে সেইদিকেই নিয়োজিত করবে। সমষ্টিচেতনার এই প্রতিবোধই প্রকৃতির নব-পরিণামের প্রথম পর্ব।

চেতনার উত্তরায়ণের তা হলে এই রীতি : প্রথমে চাই প্রকৃতিপরিণামের একটা সূক্ষ্ম ভিত্তি, সেই ভিত্তি হতে আধারশক্তির উদ্গয়ন এবং তার ফলে চেতনার রূপান্তর ; তারপর রূপান্তরিত চেতনা তার স্বধামে প্রতিষ্ঠিত থেকেই নেমে আসবে অবর-ভূমিতে এবং তার রূপান্তর ঘটিয়ে সমস্ত আধারে আনবে একটা সমাকৃ-সমাহরণের (integration) উজ্জ্বল সৌষম্য।

২৮

সপ্তধা-অবিদ্যার নিরসন

প্রকৃতির এই-যে ঊর্ধ্বপরিণাম, যার ফলে বর্তমান মনোময় ভূমি হতে অতিমানস চিন্ময়-ভূমিতে ঘটবে চেতনার উত্তরণ, সাধনার দৃষ্টিতে তার স্বরূপ হল আধারে অবিদ্যার আবরণকে বিদীর্ণ করে পরাবিদ্যার উন্মেষ ও উদ্গয়ন। অবিদ্যার কথা আমরা ইতিপূর্বে বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করেছি—দেখেছি তার স্বরূপ কি, তার অধিকার কতটুকু, তার উদ্ভব কোথা হতে, তার ক্রিয়াপরিণামই-বা কি। অবিদ্যার এই সামান্য পরিচয় হতে এবার আসতে হবে তার বিশেষ বিবৃতিতে, দেখতে হবে আমাদের চেতনায় সে আড়াল রচেছে কেমন করে।

আগেই বলেছি, অবিদ্যা বিদ্যার প্রতিষেধ নয়, তার সংকোচ। এই সংকোচের ফলেই আমাদের অনুভব সঙ্কীর্ণ হয়েছে, আমরা ভূমার ঔদার্য হতে গুটিয়ে এসেছি অল্পের কুণ্ডলীতে। বীজের মাঝে যেমন বনস্পতির বিপুলতা প্রচ্ছন্ন থাকে, অবিদ্যার এই কুণ্ডলীতেও তেমনি বিদ্যার পূর্ণমহিমা সংবৃত হয়ে আছে এবং সেই বিদ্যাশক্তির প্রেষণাতেই অবিদ্যার মাঝে চলছে আত্মবিস্ফারণের একটা তপস্যা। এই হল আমাদের জীবনায়নের লৌকিক দিক। এই তপস্যাকে সার্থক করতে হলে অবিদ্যার প্রতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের আর-এক দিক দিয়ে সচেতন হতে হবে, দেখতে হবে কি-কি সংস্কারের আবরণে আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন ও অশক্ত করে রেখেছে।

এই দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে অবিদ্যার সাতটি প্রকার (mode) দেখতে পাই। তাদের নাম দিতে পারি : মূলা অবিদ্যা, সাংস্থানিক অবিদ্যা, চিত্তগত অবিদ্যা, কালগত অবিদ্যা, অহংগত অবিদ্যা, বিশ্বগত অবিদ্যা এবং ব্যাবহারিক অবিদ্যা। এদের মধ্যে মূলা অবিদ্যা আর ব্যাবহারিক অবিদ্যা যেন দুটি বন্ধনীর মত, তাদের মধ্যেই সম্পুটিত রয়েছে আর পাঁচটি অবিদ্যা। ব্রহ্মই আমাদের আত্মস্বরূপ, অথচ তাঁকে আমরা জানি না—এই হল অবিদ্যার গোড়ার কথা বা মূলা অবিদ্যা। এই অবিদ্যার ফলেই আমাদের প্রাকৃত জীবনে এত বিপর্যয়। আমরা অসত্য প্রমাদ অধর্ম এবং অনর্থ দ্বারা লাঞ্ছিত, আমরা অতৃপ্ত কামনা শক্তির দৈন্য এবং মৃত্যুর বিভীষিকায় জর্জরিত, আমরা অহংকৃত দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ প্রেমহীন ও নিরানন্দ। ব্রহ্মকেই যদি আত্মস্বরূপ বলে জানি, তাহলে আমাদের এ দুর্ভোগ দূর হয়, এই মর্ত্য-জীবনই অমৃতবর্ণ দিব্য-জীবন হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্তরের পুঞ্জীভূত অন্ধসংস্কার দূর করতে না পারলে তো ব্রহ্মকে জানা সহজ হয় না। তার জন্য তীক্ষ্ণ আত্মবিশ্লেষণ দরকার। অবিদ্যার ঘোর যে কতদিক দিয়ে আমাদের ছেয়ে আছে, এই বিশ্লেষণের ফলে তা ধরা পড়ে।

এইবার একে-একে অবিদ্যার ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের পরিচয় নেওয়া যাক্।

সবার আগে বলতে হয় সাংস্থানিক (constitutional) অবিদ্যার কথা, কেননা আমাদের প্রাকৃত জীবনদর্শনের গোড়ায় রয়েছে এই অবিদ্যার ঘোর। যে-সব উপাদানের বিশেষ সংস্থানে (organisation) প্রাকৃত আত্মভাবের সৃষ্টি, এই অবিদ্যা তাদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে করেছে অচেতন ও সঙ্কুচিত। বর্তমানে আমরা আছি জড়ের ভূমিতে এবং আমাদের মাঝে মানস-বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-মানসের ক্রিয়াই প্রবল। সাংস্থানিক অবিদ্যা এই গণ্ডীর বাইরে আমাদের যেতে দেয় না। ইন্দ্রিয়ের সহায়ে জড়ের জগৎকে যেমনটি দেখা যায়, জড়াশ্রয়ী বুদ্ধির কারবার তাকেই নিয়ে। কিন্তু সত্তার পাদপীঠ হিসাবে জড়ের একটা সার্থকতা থাকলেও তারই কাছে আত্মসমর্পণ করার অর্থ হল প্রগতির পথকে রুদ্ধ করা। সম্প্রতি জড়বাদের আশ্চর্য উন্নতি ও প্রসার হওয়া সত্ত্বেও আমরা মানুষহিসাবে কিন্তু খুব এগিয়ে যেতে পারিনি, বরং পিছিয়েই এসেছি বলতে হবে। আমাদের আয়োজন আছে অপর্যাপ্ত, কিন্তু শান্তি নাই। আমাদের ইন্দ্রিয়-নির্ভর বুদ্ধি প্রাণ ও মনের বিপুল প্রসার ঘটিয়েছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-মানসের ঊর্ধ্বে নতুন কোনও ভূমির সন্ধান দিতে পারেনি। আমরা বুদ্ধিজীবী কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ নই : আমরা প্রজ্ঞাবাদী মাত্র, কিন্তু অন্তরাবৃত্তচক্ষু নই, তত্ত্বদর্শী নই। তাই আমাদের মানস সমৃদ্ধির নেপথ্যে এখনও আদিম জান্তব প্রবৃত্তিরই হানাহানি, আমরা ভদ্র-বেশী সভ্যতাভিমানী বর্বর।

মনোময়ী সিদ্ধি উপেক্ষার বস্তু নয়, সে-ও একটা আর্যসম্পদ। মানুষ মনোময় জীব, মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ভিতর দিয়ে তার প্রগতির পথ। তার বন্ধনমুক্ত মন যখন অবর-ভূমির অভিনিবেশ ছাপিয়ে একটা ভাবসংশুদ্ধি ও ঊর্ধ্বমুখীনতার প্রেরণায় ভাস্বর হয়ে ওঠে, তখন মানসবীর্যের প্রভাবে আধারের অন্নময় ও প্রাণময় ভাগেরও একটা রূপান্তর ঘটে। এমনিতর একটা জীবনদর্শনই ছিল প্রাচীন গ্রীক মনস্বীদের আদর্শ এবং তার প্রভাব সমগ্র মানবজাতির 'পরে এবং বিশেষ করে ইউরোপের 'পরে নিতান্ত সামান্য নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মর্মগ্রহণ ও সাধনার অভাবে গ্রীসের আধ্যাত্মিকতা পড়ে রইল ইউরোপের চিত্ত-প্রাঙ্গণের বাইরে। তার কারণ, শুধু মনই তো আমাদের সত্তার সবখানি নয়। আমাদের মাঝে আছে চিন্ময় সত্তা, আত্মপ্রকৃতির একটা চিন্ময়ভূমি। মনের সাধনাকে যদি তার অনুগত না করতে পারি, তা হলে শুধু বুদ্ধিবৃত্তির অকল্পনীয় প্রসারেও জীবনে একটা আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব থেকেই যাবে। চিৎ আর জড় এইখানে দেখা দেয় অন্যোন্যবিরোধী দুটি তত্ত্বরূপে। চিৎশক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা এবং জড়ের প্রতি মূঢ় আসক্তি মানসী সিদ্ধিকে তখন বিরোচনের আসুরী সম্পদের পর্যায়ে নামিয়ে আনে—বর্তমান জগতে যার পরিচয় অহরহই পাচ্ছি। এইজন্যই বিশ্বমানবের যথার্থ প্রগতিসাধনার প্রথম অঙ্গই হল জড়প্রকৃতির কাছে প্রকারান্তরে আত্মসমর্পণের দৈন্য হতে আত্মাকে মুক্ত করা। তখনই আমাদের চিত্ত হতে খসে পড়বে সাংস্থানিক অবিদ্যার বন্ধন। আমরা জানব, সম্প্রতি মন আমাদের মুখ্য সাধন এবং কায়-প্রাণ গৌণ সাধন হলেও বস্তুত আমরা চিৎ-স্বরূপ। এই চিৎস্বরূপের বীর্যকে দেহে-প্রাণে-মনে সঞ্চারিত করে তাদের নিগূঢ় বিভূতিকে আধারে স্ফুরিত করাই আমাদের জীবনাদর্শ।

কিন্তু জড়াসক্তি হতে চিত্তকে মুক্ত করে সাংস্থানিক অবিদ্যার ঘোর কাটাতে হলে চিত্ত-গত অবিদ্যাকে দূর করতে হবে। বহিশ্চর জাগ্রৎ-চেতনাই আমাদের সত্তার সবখানি, তার উপরে-নীচে আশে-পাশে আর কিছুই নাই—এই মনে করা হল চিত্তগত অবিদ্যার লক্ষণ। স্বীকার করি, জাগ্রৎ আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট, ইন্দ্রিয়ের দেখা জগৎটার চাইতে নিরেট আর-কিছুই হতে পারে না; তবুও ইন্দ্রিয়জগতের পিছনে একটা ভাবের জগৎকে স্বীকার না করেও তো আমরা পারি না। শুধু ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার নিয়ে যে পড়ে আছে, সে পশু; কিন্তু ইন্দ্রিয়ার্থের গভীরে ভাবের ব্যঞ্জনা যে ফুটিয়ে তুলতে পারছে, সে মনস্বী, সে মানুষ। ভাবে চেতনার প্রসার ঘটে, অনুভবের বৈচিত্র্য একটা ছন্দোময় সৌষম্যে সংহত হয়, বস্তুর গভীরে আবিষ্কৃত হয় অর্থের একটা গূঢ়দীপ্তি, সত্তা নন্দিত হয় তার আস্বাদনে। কবি দার্শনিক বা মরমীয়ার তো কথাই নাই, প্রাকৃত মানুষের জাগ্রৎ-চেতনাতেও অল্পবিস্তর

এই ভাবের আবেশ থাকেই, নইলে তার ব্যবহার অচল হয়ে পড়ত। ভাবের সংশুদ্ধি এবং উৎকর্ষের সাধনাই হল মনুষ্যত্বের সাধনা।

ভাব অন্তর্মুখ। যে ভাবুক, সে অন্তশ্চেতন। পশুর চাইতে মানুষের মাঝে এই অন্তশ্চেতনা বেশী। অন্তশ্চেতনার দুটি প্রাকৃতরূপ হল স্বপ্ন আর সুষুপ্তি, অতি সাধারণ মানুষও এদুটির সম্বন্ধে বেশ সচেতন। স্বপ্ন আর সুষুপ্তি চেতনার যে-গভীরতার দিকে ইশারা করে, যৌগিক উপায়ে জাগ্রৎ-চেতনাকেও তার মাঝে নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে একথার ইঙ্গিত আমরা আগেই করেছি। তখন এই ইন্দ্রিয়-নির্ভর জাগ্রৎ-চেতনারও গভীরে এবং তাকে ঘিরে তাকে ছাপিয়ে চেতনার আরও কতকগুলি পরিমণ্ডল আবিষ্কৃত হয়। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক মহলে অবচেতনার আবিষ্কার মনোবিদ্যার জগতে একটা যুগান্তর এনেছে। যে জাগ্রৎ-চেতনার 'পরে আমাদের লৌকিক ব্যবহারের নির্ভর, যার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে এতদিন আমাদের সংশয় ছিল না, আজ শুনি তার বেশির ভাগ কারবারই চলে অবচেতনা বা নিশ্চেতনার ইশারায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকও এই অবচেতনার নিঝুমহলে ঢুকেছেন প্রাকৃত-বুদ্ধির দীপটি হাতে নিয়ে, তাতে তার অতিসামান্য পরিসরই আলোকিত হয়েছে। অন্তর্মুখ চেতনায় যোগজ প্রজ্ঞার দীপে অবচেতনারও গভীরে আবিষ্কৃত হয় অধিচেতনা, পরিচেতনা ও অতিচেতনার বিপুল পরিমণ্ডল—যারা প্রাকৃত চেতনার সমস্ত শক্তির উৎস, নানা অলৌকিক বিভূতির আধার। চেতনার এই পরিমণ্ডলগুলি আজগুবী কিছুই নয়,—আগেই বলেছি প্রাকৃত মানুষের স্বপ্ন ও সুষুপ্তির ভিতর দিয়েই তাদের মাঝে পৌঁছবার রাস্তা আছে। স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মাঝে যে ইন্দ্রিয়োত্তর অন্তর্মুখীনতার ইঙ্গিত আছে, তাকেই যদি আমরা কৌশলে জাগ্রতের মাঝে নিয়ে আসতে পারি এবং জাগ্রতের স্পষ্টতাকেও তাদের মাঝে সঞ্চারিত করতে পারি, তাহলে অন্দরে-সদরে আনাগোনার পথটা সহজ হয়ে যায়। এই জন্যই যোগীর জগৎ শুধু এই ইন্দ্রিয়নির্ভর জাগ্রৎ-চেতনার জগৎ নয়—স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয় এই তিনটি অপ্রাকৃত চেতনার ভূমি নিয়েও তাঁর কারবার। প্রাকৃত আর অপ্রাকৃতের মাঝে সেতু হল ভাবের জগৎ—ব্যাবহারিক জগতের অন্তর্যামীরূপে সাধারণ মানুষের কাছেও যা নিতান্ত দুর্লভ নয়। ভাবসংশুদ্ধি, অন্তর্মুখীনতা ও নিত্যসমনস্কতা—এরাই হল অন্তর্জগতের দিশারী। এদেরই সহায়ে এই জাগ্রৎ-ভূমিতে থেকেই চিত্তগত অবিদ্যার সঙ্কোচকে পরাভূত করে সর্বগত চৈতন্যের মহাবৈপুল্যে অবগাহন করা সম্ভব হয়।

এমনি করে জড়াসক্তি যদি ছাড়তে পারি এবং নিত্যসমনস্কতার দ্বারা চেতনার যদি সম্প্রসারণ ঘটাতে পারি, তাহলে অধিচেতনা আর অতিচেতনার দুয়ার দিয়ে এই আধারে

নিগূঢ় অন্তঃপুরুষকেও আমরা জানতে পারি। এই অন্তঃপুরুষের অনুভবে আত্মসত্তার নিত্য-স্থিতি যখন হয় আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয়, তখন আমাদের কালগত অবিদ্যার বন্ধনও খসে পড়ে। এখন আমাদের আত্মসত্তার অনুভবের দুপাশেই জন্ম আর মরণের দাঁড়ি টানা রয়েছে। এক অব্যক্ত হতে জন্মের দুয়ার দিয়ে আমরা এজগতে এসেছি, আবার মৃত্যুর দুয়ার দিয়ে আর-এক অব্যক্তের মাঝে চলে যাব—দুয়ারের ওপারে কি আছে কিছুই জানি না। বাইরের জীবনটাকে আঁকড়ে আছি বলে তার উপর একটা মায়া পড়ে গেছে; তার বিলোপের কথা ভাবতে গেলে আমরা আঁৎকে উঠি, তাই আত্মার অমরত্বের কল্পনা দিয়ে নিজেকে আশ্বস্ত করি। কিন্তু কেউ যদি বলে, বর্তমানের এই আধিব্যাধিজর্জরিত আত্মসত্তার এমন-কোনও মর্যাদা নাই যে তাকে লোকান্তরে টিকিয়ে রাখতে হবে বা ইহলোকে বারবার আবর্তিত করতে হবে, সুতরাং জন্ম দিয়ে যে-অস্তিত্বের শুরু হয়েছিল মৃত্যুতেই তার শেষ, তাহলে তার জবাব কিছুই নাই। বস্তুত আমাদের বহিশ্চর আত্মভাব নিত্যপরিণামী, তার নিত্যসত্তার কল্পনা অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু অন্তরের গভীরে ডুবে চেতনার পরিপূর্ণ প্রসারণে যে-আত্মসত্তার সাক্ষাৎ পাই, তা শাশ্বত এবং এই পরিণমমান আত্মভাবের সে ভর্তা। বিভু আত্মাই যে নিত্য-আত্মা এবং তার স্ফুরত্তাই (dynamism) যে প্রাকৃত আত্মভাবের প্রযোজক এবং নিয়ামক—এই অপরোক্ষ অনুভবে তখন আত্মার অমরত্ব লোকান্তর এবং জন্মান্তর সিদ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে পরের অধ্যায়গুলিতে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব।

নিত্য আত্মসত্তার সাক্ষাৎকারে কালগত-অবিদ্যার বাঁধন খসে পড়লে সেই সঙ্গে অহংগত অবিদ্যাও দূর হয়ে যায়। আমাদের প্রাকৃত অহং যথার্থ আত্মভাবের একটা বিকৃতি মাত্র। চিৎপরিণামের পূর্ণতর পর্বে তার একটা প্রয়োজন আছে, একথা আগেও বলেছি। নির্বিশেষ বিশ্বশক্তির আয়তনের মাঝে সংহতির একটা কেন্দ্র না গড়লে শক্তির লীলা-বৈচিত্র্য সক্রিয় হয় না, অহং প্রথমত সেই কাজটি করে। স্থূলে হ'ক, সূক্ষ্মে হ'ক, অহং রূপ গড়ে চলে। কিন্তু রূপের সার্থকতা ভাবের প্রকাশে। রূপ যেখানে সীমার চিহ্ন দিয়ে ভেদের সৃষ্টি করে, ভাব সেখানে জোটায় অভেদের ব্যঞ্জনা। রূপের ভেদ একই ভাবের বৈচিত্র্যপ্রকাশের সাধন—এই হল বিশ্বরূপের মর্মকথা। রূপ বাইরে, ভাব অন্তরের গভীরে। ভাবে অবগাঢ় চেতনা দেখে একই কাণ্ড হতে বহু শাখার বিস্তার, শাখায়-শাখায় একই চিন্ময় প্রাণরসের সঞ্চরণ। অহং তখন আত্মা, বস্তুত 'অহং বহু স্যাম্'—এই মন্ত্রে অনুরণিত হয়ে চলেছে এক অদ্বৈত আত্মভাবনারই আকুতি।

এই বোধে বিশ্বগত অবিদ্যার প্রলয়ে বিশ্বচেতনার উন্মেষ ঘটে—আমি আর বিশ্ব তখন একাত্মক। পরাক্‌দৃষ্টিতে (objectively) রূপে আমি একক; আবার প্রত্যক্‌দৃষ্টিতে (subjectively) ভাবে আমি এক। ঐক্যের এই দুটি মেরুর মাঝে বিশ্বের

বৈচিত্র্য বা বহুত্ব। অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাকৃতচিত্ত বহির্মুখ বলে খণ্ডরূপকে আঁকড়ে ধরে—একত্বের অনুভব ঐখানে তার কাছে সুস্পষ্ট; ভাবের একত্ব তার কাছে আবছা, বিশ্বের বহুত্ব সংঘাতের হেতু। কিন্তু চিত্তের অন্তর্মুখীনতার সঙ্গে-সঙ্গে ভাবের ঐক্য অনুভূতিতে যতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, রূপভেদের সংঘাতটাও ততই মিলিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে আত্মার ব্রহ্মসাযুজ্যে সব-কিছুই পর্যবসিত হয় পরম ঐক্যে—একেরই অনুত্তর অনির্বচনীয়তা যেমন বিচ্ছুরিত হয় বিশ্বরূপে, তেমনি আবার সংহত ও সান্দ্র হয় চিদ্‌ঘন জীববিগ্রহে। বিশ্বোত্তর ব্রহ্ম, বিশ্বাত্মক ব্রহ্ম আর জীবঘন ব্রহ্ম তিনেরই সামরস্যের অনুভবে মূলা অবিদ্যার আবরণও খসে যায়।

এমনি করে আত্মবিদ্যার অন্তরঙ্গ সকল সাধন পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণসিদ্ধ হলে অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দের বীর্য ব্যবহারেও স্ফুরিত হয় এবং ব্যাবহারিক অবিদ্যার সঙ্কোচ ও দৈন্যও আর থাকে না। অবিদ্যার জীবন তখন রূপান্তরিত হয় শ্রুত-চিন্ময় পুরুষের দিব্য জীবনে, আধারের মনোময় ছন্দ পরিণত হয় অতিমানস চিন্ময় ছন্দে।

তাহলে, অবিদ্যা-নিরসনের সাধনার মূল কথা হল বোধিদীপ্ত ভাবনার দ্বারা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আমাদের কতগুলি অভ্যস্ত সংস্কারের মূলোৎপাটন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়ের জগৎকেই যে আমরা একমাত্র সত্য বলে আঁকড়ে ধরেছি সবার আগে এ-গ্রন্থি ছাড়তে হবে। তারপর এই জগৎকে আশ্রয় করে রয়েছে যে জাগ্রৎ-চেতনা তারও বাইরে ও গভীরে চেতনাকে প্রসারিত করতে শিখতে হবে এবং তার জন্য মননকে বস্তুনির্ভর না করে করতে হবে ভাবনির্ভর। চেতনা তখন স্বভাবতই অন্তর্মুখ হবে এবং ভাবের ইশারাকে অনুসরণ করে পৌঁছবে আত্মসত্তার নিত্যভূমিতে। সেখানে গেলে অহংএর গণ্ডি ভেঙে আত্মসত্তা প্রসারিত হবে বিশ্বসত্তায় এবং এই জাগ্রতের অনুভবই তখন যুগপৎ উচ্ছ্রিত হবে বিশ্বোত্তীর্ণের তুঙ্গতায়, নিপাত হবে নিত্য জীবদ্ঘের গভীরে, পরিব্যাপ্ত হবে বিশ্বাত্মভাবের বৈচিত্র্যে।

এই অন্বয় অনুভবই অবিদ্যানির্মুক্ত বিদ্যার অনুভব।

[ক্রমশঃ]

শ্রীঅরবিন্দ-স্মরণে

(বেতার কথিকা ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৪)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে এই মর্ত্যধামে শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব ; ঐ বৎসরেই উনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা-যজ্ঞের মন্ত্রদাতা ঋষি ব্যাংসিনির তিরোধান ঘটে এবং বঙ্কিম-চন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' আত্মপ্রকাশ করে। ঠিক পঁচাত্তর বছর পরে ১৯৪৭ সালের ঐ ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়।

শ্রীঅরবিন্দের জীবন, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাস পূর্বাপর অনুধাবন করলে সন তারিখের এই যোগাযোগ আর মিলকে কিছুতেই কাকতালীয় বলা চলে না। এবং, বলা চলে না বলেই এই পনেরই আগষ্ট তারিখটিকে আমাদের আরো বেশী করে স্মরণ করতে হবে ; ঐদিনটিতেও আমরা ভারতভাগ্য-বিধাতাকে প্রণাম নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দকেও প্রণাম জানাব।

শ্রীঅরবিন্দের সকলের দৃষ্টিগ্রাহ্য লৌকিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে বহু ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যাঁরা তাঁর অন্তর্মুখ আধ্যাত্মিক জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন—তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর অধ্যাত্মজীবন ও যোগসাধনা সম্বন্ধে অনেক নিগূঢ় আলোচনা করেছেন, তাঁর কাব্য ও দর্শন বিষয়েও পৃথিবীর বহু মনীষী স্ব স্ব চিন্তাধারা প্রকট করেছেন। এই সকল গ্রন্থ ও বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের একটি সুষ্ঠু সংক্ষিপ্ত পরিচয়-সম্বলিত তালিকা প্রকাশিত হলেই বর্তমান জাগতিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর তাঁর প্রভাব সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা সহজ হবে ; দিনে দিনে এই প্রভাব যে ব্যাপকতর হচ্ছে শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে আলোচনার পরিমাণ বৃদ্ধিই তার প্রমাণ।

এই সব সত্ত্বেও শ্রীঅরবিন্দের নিজের ধারণা ছিল, **"No body except myself can write my life—because it has not been on the surface for man to see"**—অর্থাৎ "আমি নিজে ছাড়া আর কারো পক্ষে আমার জীবনী লেখা সম্ভব নয়, কারণ আমার জীবন মানুষের দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে বাইরে ভেসে নেই।" না থাকলেও ১৯১০ সন পর্যন্ত স্বদেশী যজ্ঞের হোতা অরবিন্দ যেমন রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি ঋষিদের দূরদৃষ্টিতে স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তিরূপে ধরা পড়েছেন, পরবর্তীকালে তাঁর নিজের মননশীল আত্মপ্রকাশের মধ্যেই তিনি নিজেকে ধরা দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর আধ্যাত্মিক সাধন-জীবনের পরিচয় আছে তাঁর

অসংখ্য রচনার মধ্যে। শ্রীঅরবিন্দের পঞ্চান্ন বছর পূর্ণ হলে ১৯২৭ সনের ১৫ই আগষ্ট তাঁরই স্বদেশীমন্ত্রে-দীক্ষিত এক পণ্ডিত শিষ্য (শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ) তাঁর সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য জীবনী রচনা করতে গিয়ে বলেন: পুরাতন অরবিন্দ ঘোষ ও নতুন শ্রীঅরবিন্দের নামে সামঞ্জস্য থাকলেও তাঁরা এক নন, আগের জন মৃত, পরের জন কর্মজগতে দিব্য লীলা প্রকট করার জন্য সম্পূর্ণ নতুন জীবনের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। তাঁর একালের আর একজন খ্যাতনামা ভক্ত তাঁকে ঋষি, জ্ঞানী, প্রেমী ও যোগী এই চাররূপে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যাঁরা একান্ত ভাবে তাঁর প্রদর্শিত পথের পথিক নন তাঁরা তাঁকে দেখেন কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকরূপে। কিন্তু ভক্তি বা যুক্তি কোন একটা দিয়েই মানুষকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় না। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর চিরজীবনের সাধনার দ্বারা মহামনুষ্যত্বের বা দিব্যজীবনের কোন্ পর্যায়ে উঠেছিলেন তা না জানলে তাঁকে জানা সম্ভব নয়, কারণ তিনিই স্পষ্টভাবে বলেছেন "To me the ultimate value of a man is not to be measured by what he says nor even by what he does, but what he becomes" অর্থাৎ "মানুষের শুধু কথা দিয়ে অথবা কাজ দিয়ে তার চরমমূল্য নিরূপিত হয় না, সে কি হয়ে উঠলো তাই দিয়েই তার আসল বিচার।" যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের এই কিছু হয়ে ওঠাটা ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণা ও সাধনার দ্বারা বুঝতে পেরেছেন বা পারছেন তাঁদেরই মনের গহনে প্রবেশ করে আমাদের অরবিন্দতত্ত্ব জানতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যৎ মহৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা করেন আইনজীবী হলেও কবি চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর কথাগুলি যে নিছক ওকালতি নয়, তা যে বস্তুর ঋষি-দৃষ্টি-প্রণোদিত তা আজ প্রমাণিত হয়েছে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ই মে ভোর ৫টায় সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অপরাধে অরবিন্দ ঘোষ ধৃত হয়ে বিচারসাপেক্ষ বন্দীরূপে আলিপুর জেলে আটক থাকেন। অক্টোবর মাসে সেসন্স্ বিচারালয়ে মামলা আরম্ভ হয়, কিছুদিন পরে ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ আসামীর পক্ষ সমর্থন করতে দাঁড়ান। জজ ও জুরির প্রতি তাঁর ঐতিহাসিক আবেদন শেষ হয় ১৯০৯ সনের ১৩ই এপ্রিল। এরও একমাস পরে মে মাসের মাঝামাঝি অরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে কারামুক্ত হন। কারাগারে একঘরে নিভৃত নির্জনে একান্ত আত্মসমাহিত থেকে তাঁর আধ্যাত্মিক বা যোগজীবন আরম্ভ হয়, আমরা মোটামুটি এই রকমই ধরে থাকি। এর আগের কর্মী অরবিন্দ ধ্যানী অরবিন্দে রূপান্তরিত হন। এই রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেন চিত্তরঞ্জন দাশ, তাই তিনি তাঁর আবেদন এই মর্মস্পর্শী ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে শেষ করতে পেরেছিলেন—

"Long after he is dead and gone his words will be echoed and reechoed not only in India, but across distant seas and lands...

I appeal in the name of the very ideal that Aurobindo preached and in the name of all the traditions of our country..."

অর্থাৎ "তাঁর তিরোভাবের দীর্ঘকাল পরেও তাঁর বাণী শুধু ভারতের নয়, দূর সমুদ্র ও দেশ দেশান্তর পার হয়েও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে।...অরবিন্দ যে আদর্শপ্রচার করেছেন এবং আমাদের দেশের আদর্শ যা আমি তারই দোহাই দিচ্ছি।"

অরবিন্দের আদর্শ ও ভারতের চিরন্তন আদর্শ যে এক এই উপলব্ধি চিত্তরঞ্জনের হয়েছিল এবং সে উপলব্ধি যে সত্য ১৯১৪ থেকে ১৯২১ এই আট বছরের তৎসম্পাদিত 'আর্য' পত্রিকা তার প্রমাণ বহন করছে। বিশেষ করে ১৯১৮, ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৯২১, ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত 'আর্যে' প্রকাশিত যে রচনাগুলি সম্প্রতি 'The Foundations of Indian Culture'—'ভারত সংস্কৃতির ভিত্তি' গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে ভারতের বাণী-আত্মা শ্রীঅরবিন্দকে জানবার তারই মধ্যে ধরতে পারব।

পরবর্তী আধ্যাত্মিক শ্রীঅরবিন্দ ধরা দিয়েছেন তাঁর যোগগ্রন্থগুলিতে, তাঁর 'দিব্য-জীবনে' এবং সর্বশেষে তাঁর 'সাবিত্রী'তে। আগেই বলেছি এই শ্রীঅরবিন্দকে বুঝতে হলে আমাদের মত সাধারণ লোকের তাঁর ঘনিষ্ঠ তরণাধকদের শরণাপন্ন হতে হলে। শ্রীঅরবিন্দের সাধনার ক্রমপরিণতি বোঝাতে তাঁদেরই একজন যা বলেছেন সংক্ষেপে তার মর্ম হল এই :—

অরবিন্দ স্বদেশীযুগের পর কর্মক্ষেত্র থেকে বিদায় নেননি, নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে একটা বৃহত্তর উন্নততর কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলেছিলেন। রাষ্ট্রগুরু অরবিন্দ ও যোগাগুরু শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে ক্রমপরিণতির একটা অবিচ্ছিন্নধারা আছে। তিনি দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন তাই গোড়ায় দেশের চরণে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছিলেন কিন্তু অবিলম্বে বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতের সমস্যা সমগ্র জগতেরই সমস্যা। সে সমস্যা কি? সমগ্র মানবজাতির ঐক্যসাধন; ভারতের লক্ষ্য এই ঐক্য-যজ্ঞে পৌরোহিত্য করা। পাশ্চাত্য দেশের স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব Liberty, Equality, Fraternity আসলে স্বাধীনতা ও সাম্যের দিক থেকে সার্থক হলেও সেখানে ভ্রাতৃত্ব-বোধ বিকাশলাভ করেনি। অরবিন্দ অনুভব করলেন যে মানবজাতির ঐক্যসাধন শুধু রাজনৈতিক যুদ্ধ ও চুক্তির দ্বারা অথবা বিভিন্ন মতবাদের প্রচারের দ্বারা হবে না; এ ঐক্য আনতে পারে একমাত্র ভারতবর্ষ তার যুগযুগান্ত-সঞ্চিত তপোবলের দ্বারা। প্রকৃত স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব আসতে পারে শুধু মানুষের বর্তমান চেতনার কেন্দ্র অতিক্রম করে অতিমানস বা বিজ্ঞানলোকে অধিষ্ঠিত হতে পারলে; একমাত্র যোগ-প্রভাবেই এটা সম্ভব। তাই বিশ্বমাতার (Mother) ইঙ্গিতে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন যোগসাধনায় এবং বিশ্বাস করতেন যে ভারতের তপোবলকে

উদ্বুদ্ধ করে বিশ্বমানবের ঐক্যসাধনেই ভারতবর্ষের সার্থকতা এবং এই কাজেই আছে বিশ্ব-সমস্যার পূর্ণ সমাধান।

এই শুভদিনে শ্রীঅরবিন্দ-প্রণাম শেষ করছি এই দার্শনিকের উক্তি দিয়ে।

"অনেকে প্রশ্ন করেন, শ্রীঅরবিন্দ যা বলতে চান তা কি সম্পূর্ণ নূতন?* অতীতে বা বর্তমানে কেউ কি তাঁর এই আদর্শের সন্ধান পাননি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলব, শ্রীঅরবিন্দের বাণী অভিনব কিন্তু অতীতের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন নয়। প্রাচীন ভারতে বৈদিক ঋষিরা দেব-জন্মের স্বপ্ন দেখেছিলেন। পুরাণসমূহে সত্যযুগের কল্পনা এবং গীতায় ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনের আদর্শ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। যীশুখৃষ্ট দেখেছিলেন মর্ত্যে স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠায় এক দিব্য-দৃষ্টি। আধুনিক বিজ্ঞানেও দেখতে পাই অমরত্বলাভের একটা উন্মাদনা, মৃত্যুকে জয় করবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ অখণ্ড এক মানবসঙ্ঘের আদর্শ ভাবী সমাজের অগ্রদূত হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু ঠিক কি নিয়ে কোন্ শক্তির সহায়ে অমৃতত্বের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করা যায় তার প্রথম সন্ধান দিলেন শ্রীঅরবিন্দ। তিনি স্পষ্টভাবে দেখলেন যে মানসস্তরে mental level-এ অবস্থান করে ধর্মের উদ্দীপনা বা নৈতিক বল, বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বা রাজনৈতিক চুক্তি-সাধন এসব কিছুই শাশ্বতভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে না। অমৃতত্বলাভের একমাত্র উপায় যোগবলে মানসস্তর অতিক্রম করে অতিমানস রাজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ এবং সমগ্র সত্তার আত্ম-নিবেদনের মধ্য দিয়ে সেই অতিমানস শক্তিকে জীবনের প্রতিস্তরে কার্যকরী করে তোলা।"

(শ্রীহরিদাস চৌধুরী)

---

* এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের দুটি কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি এখানে—যদিও কথা দুটি আপাতবিরোধী:

(১) The object of spiritual seeking is to find out what is eternally true, not what is new in time.

আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার লক্ষ্য কালের ধারায় নূতন যা তা নয়, যা চিরন্তন সত্য তাকেই আবিষ্কার করা।

(২) Our Yoga is not a retreading of old walks but a spiritual adventure.

আমাদের সাধনা পুরাতন ধারায় ফিরে চলা নয়, তা হল একটা আধ্যাত্মিক অভিযান —সম্পাদক

ঈশোপনিষদ

শ্রীঅরবিন্দ

(অনুবাদ, পূর্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় প্রবাহ

মহেশ্বর

(শ্লোক, ৮-১৪)

'সঃ' :

এ উপনিষদে বিচারের তৃতীয় প্রবাহে কর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করা হচ্ছে। দ্বিতীয় শ্লোকে সাধারণভাবে এ বিষয় পূর্বেই বলা হয়েছে। এখন আরও বিশেষভাবে সে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হল ব্রহ্ম বা মহেশ্বররূপে পরমাত্মার ধারণার উপর ; 'ঈশঃ', 'পরঃ পুরুষঃ', 'সঃ', যাঁহাদের যিনি মূল কারণ, গুণের যিনি আধার এবং যিনি শাশ্বত কাল রূপে তাঁরই আত্ম-সত্তার অভ্যন্তরে কল্পিত ও রূপায়িত, তিনি জগৎ-গতির ছন্দ ও সর্বলোকের বিন্যাসক্রম তাঁর নিয়মে শাসন করেন।

একটা ভুল ধারণা আছে যে, উপনিষদের শিক্ষাতে একমাত্র সত্য অস্তিত্ব হল নির্বিশেষ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম, বিভূতিহীন উপাধিহীন নির্গুণ ভগবান। বরং তার বাণী হল যে, এক পরম অজ্ঞেয় আমাদের কাছে সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপে অভিব্যক্ত হন। অত্যন্ত সাধারণ ও ব্যাপকভাবে এই অজ্ঞেয়ের কথা বলতে হলে ক্লীবলিঙ্গ 'তৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয় কিন্তু তাতে সক্রিয় বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত সগুণভাবকে বর্জন করা হয় না (যথা, কেনোপনিষদের তৃতীয় খণ্ড)। তথাপি সগুণভাবের উপর জোর দেবার ইচ্ছা হলে প্রায়ই পুংলিঙ্গ 'সঃ' শব্দ ব্যবহৃত হয় অথবা কোন বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া হয়, যেমন, 'দেব', (ভগবান, দৈবত্ত) 'পুরুষ,' (সজ্ঞান অধ্যাত্মসত্তা, প্রকৃতি বা মায়া যাঁর কার্যকরী শক্তি)।

এ উপনিষদে পূর্বেই ব্রহ্মকে বহুবিভাবে ও বহুরূপে অভিব্যক্ত একমাত্র সত্য বলা হয়েছে, আত্মরূপে তিনি পরমাত্মা, সর্বভূত যে অদ্বিতীয় সত্তার বিভূতি এবং যাঁকে আমাদের মধ্যে তথা সর্ববস্তুর অতীতরূপে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে ; এখন কথঞ্চিৎ বাহ্যভাবে সেই ব্রহ্মকেই বলা হল ঈশ্বর, যিনি নিখিল বিশ্বকে ধারণ করেন আবার তার মধ্যে বাস করেন।

তিনি নিজেকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। সব বিশ্বলোকের অন্তর্নিবাসী মহেশ্বর, 'ঈশ:', (যাঁর নামে এ উপনিষদের আরম্ভ) এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা, অভেদ ; এবং (পরে দেখব ১৬ শ্লোকে) বিশ্বময় পুরুষের সঙ্গে তাঁর কোন ভেদ নাই ('যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি', ওই ওই যে পুরুষ সেও আমি)। সবকিছু সবসত্তা হয়েছেন তিনিই—পরম সচেতন সত্তা, একমাত্র সৎ ও স্বয়ম্ভূ ; তিনি যা হয়েছেন সে সবের তিনিই প্রভু ও ভোক্তা। এখানে, আমরা যাকে বিশ্ব বলি ভগবানের সেই সম্ভূতির প্রকৃতি ও বিকাশপদ্ধতি, তার সব সাধারণ ধর্ম এ উপনিষদে বিশেষ করে বলা হবে। কারণ মৃত্যু ও অমরত্বের কোটিময় সম্বন্ধে বেদের শিক্ষা, অজ্ঞানের অস্তিত্বের হেতু এবং বিশ্বে কর্মের আবশ্যকতা নির্ভর করে এই সত্যের উপর।

যোগবাহ ভাব : ভগবানের সগুণত্ব

বেদান্তের 'স:', ভগবান, দেব বা ঈশ্বরের ভাবনাকে সগুণ ভগবান সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাসের সব চলতি ধারণার সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। সাধারণত: গুণময়কে ব্যক্তিত্বের সমার্থক বলে নেওয়া হয় ; এবং সগুণ ভগবান সম্বন্ধে প্রাকৃত জনের ধারণা হল, স্বভাবে অতিকায় বাষ্টি মানবের মত, তবে পৃথক্, বৃহত্তর মহত্তর ও সর্বগ্রাসী। মানুষের মধ্যেও মানুষের কাছে ব্রহ্মের মানবরূপে অভিব্যক্তি বেদান্ত স্বীকার করে বটে কিন্তু তাকে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বভাব বলে মানে না।

ভগবান সচ্চিদানন্দরূপী। তাঁর আত্মপ্রকাশ হয় অন্তহীন অস্তিত্বরূপে, সে অস্তিত্বের সারস্বরূপ হল চেতনা, আর সে চেতনার সারস্বরূপ হল আনন্দ, আত্মরতি। আনন্দই যেন নিজের বৈচিত্র্য অবগত হতে এবং নিজের বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানে এই বিশ্বে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ সব ত বস্তুবিচ্ছিন্ন সংজ্ঞা ; বস্তুবিচ্ছিন্ন ধারণা ত আর নিজে থেকে প্রকৃত বস্তুরূপের উদ্ভব করতে পারে না। এসব নির্গুণ অবস্থা, নির্গুণ অবস্থা থেকে ত আর সগুণ ক্রিয়ার উদ্ভব হয় না।

সচ্চিদানন্দের অভিব্যক্তি বিচার করলে এ কথা আরও স্পষ্ট হবে। সে অভিব্যক্তিতে আনন্দ রূপান্তরিত হয় প্রেমে, চেতনা বুদ্ধিগ্রাহ্য পরমজ্ঞান ও কার্যকরী পরাশক্তির মূল সংজ্ঞাতে, আর অস্তিত্ব সত্তাতে অর্থাৎ পরমপুরুষ ও মূলপদার্থে। কিন্তু প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ না হলে প্রেম অপূর্ণ থাকে, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা না হলে জ্ঞান অপূর্ণ থাকে, কর্তা ও ক্রিয়া না হলে শক্তি অপূর্ণ থাকে, দ্রষ্টা ও উপাদানরূপী পুরুষ না হলে পদার্থ অপূর্ণ থাকে।

তার কারণ, মূল সংজ্ঞাগুলিও প্রকৃতপক্ষে বস্তুবিবিক্ত বা গুণাতীত নয়। ব্রহ্মানন্দে আনন্দের ভোক্তা একজন আছেন, ব্রহ্মচেতনাতে সংবেত্তা একজন আছেন, ব্রহ্মের অস্তিত্বে

সৎপুরুষ একজন আছেন . কিন্তু ব্রহ্মের আনন্দ ও চেতনার বিষয় এবং তাঁর অস্তিত্বের মূলবস্তু ও উপাধি তিনিই স্বয়ং। পরম পুরুষে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা এক, এবং সেই জন্যই আনন্দ-ভোক্তা-ভোগ্যও অবশ্যই এক।

ব্রহ্মের এই আত্মসংবিৎ ও আত্মানন্দের চেতনা-শক্তিতে, প্রকৃতি বা মায়াতে, ক্রিয়ার দুই ধারা আছে : আত্মসংহতিতে সমাহৃত এবং আত্মবিস্তৃতিতে বিক্ষেপী। সমাহৃতি শুদ্ধ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের আর বিক্ষেপ সক্রিয় ব্রহ্মের নিজস্ব ধারা। স্বীয় অস্তিত্বের উপাধি ও উপাদানে স্বয়ম্ভুর এই বিকিরণকেই আমরা বলি 'ভূবনং', 'জগৎ',* বিশ্বসম্ভূতি বা নিত্যগতি। ব্রহ্মই সব হন এবং ব্রহ্ম যা হন সে সবও ব্রহ্ম। প্রেমিক নিজেই প্রেমাস্পদ, কর্তার আত্মরূপায়ণই কর্ম, নিখিল বিশ্ব মহেশ্বরের দেহ ও ক্রিয়া।

সুতরাং আমরা যখন অনন্ত অস্তিত্বের বস্তুবিবিক্ত বা গুণাতীত বিভাব বিচার করি তখন বলি 'তৎ' আর যখন আত্মচেতন আত্মানন্দময় সৎপুরুষের কথা বিচার করি তখন বলি 'সঃ'। এ দুয়ের কোন ধারণাই সম্পূর্ণ নয়। ব্রহ্ম স্বয়ং সগুণ নির্গুণ সব ধারণার অতীত, অজ্ঞেয়। আমাদের বাক্য থেকে সব উপাধি ও সংজ্ঞা বর্জন করতে হলে তাঁকে আমরা 'তৎ' বলি, আবার সমানই কঠোরভাবে নির্গুণত্ব বর্জন করবার ইচ্ছা বোঝাতে তাঁকে 'সঃ' বলি। 'তৎ' ও 'সঃ' অভিন্ন, দুই-ই সেই অনির্দেশ্য পরম অদ্বিতীয়।

বিশ্বে রয়েছে একত্ব-বহুত্বের অনিবার্য সম্বন্ধ। তার প্রকাশ হয় বিশ্বপুরুষ ও বহু পুরুষ রূপে ; এবং এক ও বহুর মধ্যে, তথা বহুর সংখ্যাতীত বিগ্রহের মধ্যে, অনন্তবৈচিত্র্যময় অন্যোন্যসম্বন্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর নিজের অভিব্যক্ত সব নিবাসে ভাগবত সত্তার, মহেশ্বরের, প্রবেশলীলার দ্বারা সে সব সম্বন্ধ নিরূপিত হয়। প্রথম হয় বিভিন্ন ব্যষ্টিজীবের সজ্ঞান অন্যোন্যসম্বন্ধ, পরে তারা সেসব সম্বন্ধকে ঊর্ধ্বমুখী করে' পরমের সঙ্গে সজ্ঞান সম্বন্ধ স্থাপনের অবলম্বনরূপে ব্যবহার করে। পরমের সঙ্গে এইরূপে সম্বন্ধস্থাপনই আনুষ্ঠানিক ধর্মের কার্য ও উদ্দেশ্য, এই অপরিহার্য প্রয়োজন সাধনই সব ধর্মের সার্থকতা, সব ধর্মই এই এক সত্য নানাভাবে প্রকাশ করে এবং এই এক লক্ষ্যে বিভিন্ন পথে গমন করে।

ব্যষ্টিজীবের কাছে সগুণ ঈশ্বর নানানামে, নানারূপে আবির্ভূত হন। এক হিসাবে এসব নামরূপ মানবচেতনার গড়া, অন্যহিসাবে সে সব ভগবানের প্রত্যাদিষ্ট নিত্য প্রতীক ; এইভাবে বহুচেতনার কাছে মনের বস্তুতে গঠিত নির্দিষ্ট আকার নিয়ে ভগবান জীবকে তাঁর একত্বে প্রত্যাবর্তন করতে সাহায্য করেন।*

* এই সব ধারণা যে মূলতঃ পরবর্তী হিন্দুধর্মের উদ্ভাবিত, সে কথা মনে করা ভুল। পরম একের বহুনামের ধারণা ঋগ্বেদের সময়েই প্রচলিত।

সর্বতোগামী

সব অব্যয় ও নিত্য আনন্দে। মাণ্ডিত সাপেক্ষচেতনার যেসব সগীম ও সবিকারী ব্যাপারের সমষ্টিকে আমরা বিশ্ব বলি তার মধ্যে তিনিই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। 'স পর্যগাৎ'।

সুতরাং, এ আত্মবিস্তৃতিতে দুটি বিভাব দেখি; একটি হল বিশুদ্ধ অনন্ত নিরপেক্ষ অব্যয়ত্ব, অপরটি হল দেশে কালে অবস্থিত বিষয়ের সমষ্টি, যা নিমিত্তের মধ্য দিয়ে নিজেদের অন্যোন্যসম্বন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশ করে চলেছে। উভয়ই হল সেই এক অজ্ঞেয়, 'সঃ', পরম পুরুষের বিভিন্ন পরস্পর অনুপূরক অভিব্যঞ্জনা।

অনন্ত অব্যয়ত্ব প্রকাশ করতে এ উপনিষদে সব ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে: 'শুক্রং', 'অকায়ং', 'অব্রণং' 'অস্নাবিরং', 'অপাপবিদ্ধং'। সেই পরাৎপরকেই হেতু-আধার-শাস্তারূপে এবং বিশ্বের পদার্থসমষ্টির ও তার প্রত্যেক পদার্থের ('জগত্যাং জগৎ') অধিষ্ঠাতারূপে প্রকাশ করতে চারটি পুংলিঙ্গ বিশেষণ দেওয়া হয়েছে: 'কবিঃ', 'মনীষী', 'পরিভূঃ' বিশ্বযোনি এবং 'স্বয়ম্ভূঃ' স্বপ্রতিষ্ঠ বা স্বয়ং পরিণামী।

অবশ্য জগতে লীলার দ্বিব্য গোপন আশ্রয় সেই অব্যয় বই নয়, অপক্ষপাতে সমভাবে তিনিই সব বস্তুতে পরিব্যাপ্ত ('সমং ব্রহ্ম'*), ক্রিয়াতে কোন অংশ না নিয়ে নির্বিচারে তিনি সবকে আশ্রয় দেন। তাঁর নিত্য অব্যয়ত্বে তিনি বিশ্বাতীত ও মুক্ত বলে', মহেশ্বর গতির লীলাতে নিজেকে প্রক্ষেপ করেন এবং তার স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্বে তাঁর মধ্যস্থিত কবি যা দেখেছেন বা মনীষী যা ধারণা করেছেন, সে লীলাতে তিনি সেই সবেই পরিণত হন। 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ'।

শুদ্ধ অব্যয়

মহেশ্বরের শুদ্ধ অব্যয়ত্ব 'শুক্র' বা উজ্জ্বল। শুদ্ধ আত্মসংহত আত্মপ্রতীতির দীপ্তি সে, প্রতিসরণের দ্বারা ভগ্ন নয় বা বর্ণরূপে বিকীর্ণ নয়। এ হল পরমপুরুষের সচেতন পরমাত্মার বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান, তাঁর সামর্থ্য বা ক্রিয়াশক্তি সংবৃত নিষ্ক্রিয়।

তা 'অকায়', অঙ্গরূপ, অবিভাজ্য ও বিভাজনের লক্ষণহীন। সব বস্তুর মধ্যে সেই সমসত্ত্ব পরমপুরুষ, দেশকাল বিভাগে অখণ্ডিত শুদ্ধ আত্মসচেতন কৈবল্য।

তা 'অব্রণ', কিণাঙ্করহিত অর্থাৎ দোষত্রুটি ছিদ্র বা অপূর্ণতাহীন। কোন বিকার বা পরিণাম তাঁকে স্পর্শ করে না বা প্রভাবিত করে না। যেসবের সম্বন্ধের সব সংঘর্ষ, সব ন্যূনাধিক্য হ্রাসবৃদ্ধি, সব অনুপ্রবেশ ও অন্যোন্যসঞ্চার,—সব খেলার সেই আশ্রয়। কারণ স্বতঃ সে অব্যয়ত্ব ক্রিয়াহীন, 'অচলঃ সনাতনঃ'।†

---

* গীতা, ৫।১৯

† গীতা, ২।২৫

তা 'অস্নাবির', স্নায়ুরহিত। 'অব্রণ', কারণ তৎস্বরূপ তাঁর শক্তি প্রকাশ করেন না, বহুমুখী প্রণালীতে বলের প্রবাহ বিকিরণ করেন না, একস্থানে বলক্ষয় অন্যত্র বলবৃদ্ধি করে পূরণ করেন না, অপরা প্রেরণের সহায়ে বা বলপ্রয়োগে তাঁর অংশের বা অন্যের সন্ধান করেন না। বলবেগ সঞ্চালনের স্নায়ু তাঁর নাই, প্রাণশক্তির বা নাড়িস্পন্দের ভেল্কিরূপে তিনি নিজেকে বিকীর্ণ করেন না।

তা 'শুদ্ধ' 'অপাপবিদ্ধ'। আমরা যাকে পাপ বা অমঙ্গল বলি সে ত শুধু মাত্রার আধিক্য বা ন্যূনতা, অনুপযুক্ত স্থলে স্থাপনা, সামঞ্জস্যহীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। সমস্তের দ্বারা সব কর্মের আশ্রয় হয়েও নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা সচেতন পরমাত্মা তাঁর নিত্যমুক্তি ও নিত্য পবিত্রতা অটুট রাখেন। কারণ, তিনি অবিকৃত, সাক্ষীরূপে তিনি প্রকৃতির সব পরিণাম দর্শন করেন কিন্তু তার কোন অংশগ্রহণ করেন না, সে সবের দ্বারা তাঁর গতিরোধ হয় না বা সে সবের কোন ছাপ তাঁর উপর পড়ে না। 'ন লিপ্যতে'।

নিত্যমুক্ত পরমাত্মা

এই শুদ্ধ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সঙ্গে কি সম্বন্ধ কর্মপ্রবৃত্ত ব্রহ্মের বা মানবাত্মার? অভেদ—উভয়ই সেই তৎস্বরূপ। ক্রিয়াতে পরমাত্মার স্বভাবে কোন পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন হয় শুধু বিভিন্ন বিগ্রহের স্বভাবে। কর্মপ্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত, যে অবস্থাতেই হক না কেন, পরমাত্মা নিত্য শুদ্ধ, নিত্য পরিপূর্ণ ও নিত্য আনন্দময়।

পরমাত্মাই সব বস্তু ও সর্বাতীত। মন যা নিয়ে লিপ্ত থাকে সে হল তিনি কোন বিশেষ দেশ-কালে নিজের প্রতিনিধিরূপে যে আকার গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি সেসবের অতিশায়ী। সীমাহীন সমগ্রতা নিত্য পরিপূর্ণ। সর্বসমষ্টি ত্রুটিবিচ্যুতিহীন পূর্ণ সামঞ্জস্য। অংশকে সমগ্র বলে গ্রহণ করে যে দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থাৎ অজ্ঞান, সত্যকে সে প্রতিফলিত করে ভগ্ন বিকৃত-রূপে, আর তা থেকেই সৃষ্ট হয় সীমাবদ্ধন, অপূর্ণতা ও বিরোধের বোধ। দেখব পরে যে, ব্রহ্মের লীলাতে এ অজ্ঞানেরও একটা প্রয়োজন আছে, কিন্তু শুধু অজ্ঞানকে দেখলে প্রথম দৃষ্টিতে তাকে অমঙ্গলের জনক বলেই মনে হয়।

অজ্ঞানের আবরণ মনপ্রাণদেহকে তাদের উদ্ভব সচ্চিদানন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। সে ছায়াতে আচ্ছন্ন হয় বলে' অজ্ঞানের সৃষ্ট সব অমঙ্গলের দ্বারা মন নিজেকে বিদ্ধ বোধ করে। কিন্তু সচ্চিদানন্দ যখন দেহ প্রাণ মনের সব বিগ্রহকে আত্ম-অভিব্যক্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন, তখন তিনি সক্রিয় ব্রহ্ম; সুতরাং সে সবের অভিজ্ঞতা তিনি সচ্চিদানন্দের দৃষ্টিতেই দেখেন। অমঙ্গলের দ্বারা তিনি বিদ্ধ হন না। কারণ, তিনিও সেই অদ্বিতীয় এবং সর্বত্র তিনি একত্বই দেখেন। তাঁর সৃষ্টির অবরপদ রূপে তিনি অজ্ঞানকে ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু তিনি তার দ্বারা অভিভূত হন না।

মানবাত্মাও মহেশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন, তারও পূর্ণস্বরূপ হল অবরূপদ রূপে সজ্ঞানের প্রযোক্তা সচ্চিদানন্দ। কিন্তু এই অবরূপদের মধ্যেই সে তার সব ভাবনা কল্পনা প্রক্ষেপ করেছে, তার মধ্যে সব আবদ্ধ, তার ছাঁচেই সব গড়া যার তারই মধ্যে, সসীম মনে, সে তার দর্শনের কেন্দ্র, তার দৃষ্টিভঙ্গী, প্রতিষ্ঠা করেছে। সে অপূর্ণতা এবং, তার ফলে, অভাব-বিরোধ-বাসনা-দুঃখের বোধ সে তার নিজের উপর আরোপ করে। অন্তরালে অবস্থিত প্রকৃত মানবকে এসব বিভ্রান্তি স্পর্শ করে না, কিন্তু আপাত বাহ্যমানসকে বিচলিত করে। স্বাধীনতা ফিরে পেতে হলে তাকে তার পূর্ণতা ফিরে পেতে হবে, তার পরিপূর্ণ প্রকৃত সত্তা, অন্তরস্থ ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। তাহলেই সে মহেশ্বরের মত প্রকৃতির কর্মফলের সঙ্গে একাত্মতার ভ্রান্ত ধারণা স্বীকার না করে' প্রকৃতির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে। উপনিষদের বাণী, 'ন কর্ম লিপ্যতে নরে', মানবে কর্ম লিপ্ত হয় না, এই প্রত্যয়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

সে উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে', তাকে অন্তরস্থ শান্ত ব্রহ্মকে পেতে হবে। মহেশ্বর সর্বদাই তাঁর এই উভয় বিভাবেই অধিষ্ঠিত, তাই তিনি বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়েও নিজের কর্মে লিপ্ত না হয়ে বা তার দ্বারা সীমিত না হয়ে বিশ্বব্যাপার পরিচালনা করেন। মনে নিহিত বলে মানবাত্মার দৃষ্টি প্রকৃতির প্রচণ্ড কর্মস্রোতে আচ্ছন্ন, এবং নিজেকে প্রবাহের অংশরূপে কল্পনা করে বলে তরঙ্গাবর্তে সে ভেসে যায়। প্রকৃতির গতির মধ্যে তার আত্ম-সম্ভূতির লীলাতেও তাকে তার নিত্যসত্তা শান্তপুরুষে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাহলে সেই শান্তপুরুষের মত, সে প্রকৃতির ও তার কর্মের দ্রষ্টা ও ভর্তা ত হবেই, তদুপরি তার ঈশ্বর ও মুক্ত ভোক্তাও হবে। বিশ্বে অভিব্যক্ত ব্রহ্মের যে স্বভাব দেখি তা হল অন্তরে অনবচ্ছিন্ন শান্ত ও নিষ্ক্রিয় ভাব, পবিত্রতা ও সমতা আর বাহিরে সর্বক্ষণ অক্ষুব্ধ কর্মতৎপরতা।

সুতরাং, কর্মে আর কোন আপত্তি থাকে না। বরং মহেশ্বরের নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়, উভয় বিভাবের সঙ্গে একাত্ম ও উভয়ের অংশভাজন হওয়াতে কর্মের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। আত্মার পক্ষে সমত্ব আর শক্তির পক্ষে ক্রিয়া এই দুয়ের সাম্য নিয়ে মানবের মধ্যে ভাগবত ছন্দের সঙ্গতি গঠিত হয়।

বস্তুর ধর্ম

নিখিল বিশ্বের সব পদার্থের সৃষ্টি ('অর্থান্') হল তাঁর আত্মসত্তার বিস্তৃতিতে মহেশ্বরের সম্ভূতি। তার তত্ত্ব ত্রিদল, চেতনা ও সত্তা। চেতনা যখন তার আত্মসত্তার উপর আত্মশক্তি ('তপস্') প্রয়োগ করে তখন উদ্ভূত হয় আত্মভাবনা ('বিজ্ঞান'), আর সে ভাবনার অনুরূপ আকার ও ক্রিয়া অব্যর্থভাবে প্রসূত হয়। তারতে এই হল সৃষ্টির মৌলিক ধারণা,

আত্ম-উৎপাদন রূপে আত্মপ্রসর্পণ ('সৃষ্টি' 'প্রসব')। আবার, সত্তা তার আত্মশক্তি প্রয়োগ করে', প্রত্যেকটি আকারের অন্তর্নিহিত বীজভাবনার বিস্তৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নিজের অসংখ্যরূপ অভিব্যক্ত করে। ভারতে এই হল ক্রমবিবর্তনের মৌলিক ধারণা, সাংখ্য প্রভৃতি কয়েকটি শাখায় তা বিশেষ লক্ষণীয়। 'পরিণাম', 'বিকার', 'বিবর্ত'—একই ব্যাপার বিবিধভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

কোন কোন মনীষীর মতে বিশ্ব-অভিব্যক্তি চেতসিক মাত্র ('বিবর্ত'), স্থূল ব্যাপার রূপে তা বাস্তব নয়। অন্য মতে বিশ্ব-অভিব্যক্তি একটা স্থূল ব্যাপার, বস্তুতঃই তাতে অবস্থান্তর হয় ('পরিণাম') তবে তাতে পরম সত্তার স্বরূপে কোন ইতরবিশেষ হয় না। উভয়মতই উপনিষদ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করে ; আর, এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে যেমন দেখা গেল, প্রকৃত পক্ষে এ দুই মতের বিরোধ এসেছে প্রাচীন বেদান্তে যা অভেদ বলে' দেখা হত তার দুদিক পৃথকভাবে দেখে।

ব্রহ্ম নিজেই নিজের বিষয়, নিজেই নিজের বিষয়ী, সে তার শুদ্ধ স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্বেই হক বা বহুবিচিত্র আত্মসম্ভূতিতেই হক। তাঁর আত্মসম্বিতের তিনিই বিষয়, তাঁর আত্মসত্তার তিনিই জ্ঞাতা। এ বিভাবদ্বয় অবিচ্ছেদ্য, যদিও মনে হয় যেন একটি অপরটির মধ্যে একবার বিলুপ্ত হয় আবার তার মধ্য থেকে প্রকটিত হয়। যাকে অবিনিশ্চ বিষয়ী বলে মনে হয় তারও সেই বিষয়ীভাবের মধ্যেই সে ভাব বিষয়রূপে উহ্য রয়েছে, আর অবিনিশ্চবিষয় রূপে যা প্রতিভাত হয় তার গোচরতার মধ্যেই সেভাব বিষয়ীরূপে উহ্য রয়েছে।

সব স্থূল অস্তিত্বই নিত্যসৎ, স্বয়ম্ভূ ; প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত বীজভাবনার বলে তার পরিণতি হয়। ভাবনা হল ঘটনাতে যা অভিব্যক্ত হয় তার আত্মসংহত রূপ। কারণ স্বয়ম্ভূ কবিরূপে ব্যাপারের সারস্বরূপের মধ্যে নিজেকে দেখেন বা অবধারণ করেন, মনীষীরূপে তার সব সম্ভাব্যতার ক্রমবিবর্তনের মধ্যে নিজেকে মননের দ্বারা নির্দিষ্ট করেন এবং পরিভূরূপে দেশকালের গতিতে নিজেরই আকাররূপে পরিণত হন। এ তিনটি মিলে হয় একই ক্রিয়া তবে সাপেক্ষজগতে দেশকালগত চেতনাতে প্রক্রিয়া তিনটি পরপর প্রতীয়মান হয়।

অতএব নিষ্পন্ন হয় যে, প্রত্যেক পদার্থই নিজের মধ্যে নিয়ত তার সত্তার ধর্ম বহন করে, 'শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ', সংখ্যাহীন বর্ষ ধরে', নিত্য কালে। সুতরাং পদার্থ সমষ্টির অন্যোন্য সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হয় প্রত্যেক পদার্থের অন্তর্নিবাসী স্বয়ং পরিণামী স্বয়ম্ভুর দ্বারা ; সব বস্তুর প্রকৃতির মধ্যে তা বিধৃত হয়ে থাকে অদ্বিতীয় মহেশ্বরের সর্বব্যাপিত্বের দ্বারা, সবের অন্তরস্থ সত্তারূপী তাঁর আত্মদর্শনের দ্বারা, তাঁর আত্মসম্ভূতির দ্বারা—অন্তহীন সম্ভাব্যতার পটভূমিতে যা সবের স্থূলব্যাপারে পরিণতির অবশ্যম্ভাবী ধর্ম।

সুতরাং সব বস্তুর নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী যেমন হওয়া উচিত ঠিক সেই ভাবেই, 'যথা-তথাতঃ', নির্ভুল ভাবে তাঁর দ্বারা সব সুব্যবস্থিত হয়। সমষ্টির মধ্যে অলঙ্ঘনীয় একটা সাম-ঞ্জস্য আছে, তার দ্বারা ব্যষ্টি অভিব্যক্তির সব বিরোধের সমাধান হয়। সে বিরোধ প্রকৃত হত, নিত্য বিশৃঙ্খলতার মধ্যে তার প্রকাশ হত, যদি বিশ্বে কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টি বিগ্রহ ও শক্তি সব থাকত, যদি প্রত্যেক ব্যষ্টি বিগ্রহ ও শক্তি নিজের মধ্যে স্বয়ম্ভু সর্বময় মহেশ্বরকে ধারণ না করত এবং বস্তুতঃ তাঁর সঙ্গে একাত্ম না হত।

স্থষ্টিক্রম

স্থষ্টিক্রমের সাপেক্ষ ধারণাতে মহেশ্বর আমাদের কাছে প্রথম প্রকাশিত হন কবি, প্রাজ্ঞ বা ঋষিরূপে। কবি দেখেন স্বরূপ পরম সত্তা—তার সম্ভূতিতে, তার সত্তাতে, তার সব সম্ভাবনাতে ও অধিগত সিদ্ধিতে সত্তা। বীজ ভাবনাতে, 'বিজ্ঞানে', তিনি যেমন ধারণ করে' আছেন, তাই তাঁকে বলা হয় 'সত্যং ঋতং', সত্তা ও ধর্ম। তিনি তা সমগ্ররূপে ধারণ করেন, খণ্ড খণ্ড করে' নয়, সব বস্তুর সত্তা ও ধর্ম হল 'বৃহৎ', ভূমা। শুধু বিজ্ঞানকে দেখলে তাকে পূর্বনির্দিষ্ট নিয়তির, আত্মসংহতির, ভবিষ্যনিয়ন্তা বীজভাবের ক্ষেত্র বলে মনে হয়। কিন্তু সে নির্দেশ বিগত কোন কালে দেওয়া হয় নাই, তা নিত্যকালের; সে নিয়তি আত্মার বশীভূত, আত্মা তার বাধ্য নয়; কিন্তু গতি ও পরিণাম তার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়, গতিরূপে আত্ম-বিস্তৃতিতে তথা বীজভাবে আত্মসংহতিতে, উভয়ত্র তা বর্তমান। সুতরাং আত্মার সত্যধর্ম স্বাতন্ত্র্য ও প্রভুত্ব, বন্ধন ও দাসত্ব নয়। পুরুষ প্রকৃতিকে শাসন করে, প্রকৃতি পুরুষকে বাধ্য করে না। 'ন কর্ম লিপ্যতে নরে', মানবে কর্ম লিপ্ত হয় না।

মনীষীর আসন সম্ভাবনার ক্ষেত্রে। তাঁর পশ্চাতে রয়েছে অনন্তের স্বাতন্ত্র্য এবং সান্তকে নিয়মনের পটভূমিরূপে তিনি তা নিয়ে আসেন। সুতরাং বিশ্বে প্রত্যেকটি ক্রিয়া মনে হয় যেন, নানা সম্ভাবনার সংঘাত এবং সামঞ্জস্য থেকে আবির্ভূত হয়। কিন্তু যা অভিব্যক্ত করতে হবে তার অন্তর্নিহিত ধর্মের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা না হলে এ সব সম্ভাবনার কোনটাই বিশ্বক্রিয়া নিরূপণের জন্য কার্যকর হয় না। মনীষীর মধ্যেও কবি আছেন, তিনিই তাঁর ক্রিয়ার আশ্রয়। কিন্তু শুদ্ধমাত্র মনীষীর ক্ষেত্র দেখলে মনে হয় যেন সে হল নমনীয়তার, স্বাধীন ইচ্ছার, বহুবলের অন্যোন্যক্রিয়ার ক্ষেত্র; কিন্তু সে স্বাধীন ইচ্ছা শুধু মননে, তার প্রতিপক্ষ রয়েছে সব বস্তুর নিয়তি।

কারণ, মনীষীর ক্রিয়ার অভীষ্ট পরিণাম হল 'পরিভূ'র সম্ভূতি। 'পরিভূ'কে বিরাটও বলা হয়, ঘটনার ক্ষেত্র রূপে তিনি অবস্থিত আছেন। তিনি সম্পাদন করেন সত্যে যা বিধৃত রয়েছে, মনের দ্বারা প্রতিফলিত সব সম্ভাবনার মধ্যে যা বিকশিত হচ্ছে, স্থূলরূপে

সিদ্ধ বলে যা আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে। পৃথকভাবে বিরাটের ক্ষেত্র দেখলে তাকে মনে হয় যেন তা এক অলঙ্ঘনীয় ধর্ম ও নিয়তিনির্দেশের ক্ষেত্র যা সে ক্ষেত্রের প্রত্যেক বস্তুকে ক্রমপরিণত হতে বাধ্য করে, যেন তা কর্মের লৌহশৃঙ্খল, যান্ত্রিক অবশ্যম্ভাবিতা ও দুর্ধোধ্য নিয়মের একটা নিষ্করুণ রাজত্ব।

কিন্তু 'পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ'—বিরাটের সম্ভূতি ত মহেশ্বরেরই সম্ভূতি। সুতরাং, সে সম্ভূতির সত্য উপলব্ধি করতে হলে, জ্ঞান যেয়ে পশ্চাতে যা রয়েছে সে সবই আবার অঙ্গীকার করতে হবে। মুক্ত অনন্ত সচ্চিদানন্দের পূর্ণ সত্যে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ঊর্ধ্ব থেকে, একত্ব থেকে দেখলে এই হল বস্তুর সত্য, এই হল ভগবানের দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু মানবের দৃষ্টিভঙ্গীও আমাদের বিচার করতে হবে; সে দৃষ্টির আরম্ভ নীচে থেকে, অজ্ঞান থেকে অগ্রসর হয়ে একের পর এক এই সব তত্ত্ব সে দেখে, তাও সমগ্রভাবে নয়, চেতনার পৃথক পৃথক অবস্থারূপে। মানবত্বের স্বভাব হল অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সচ্চিদানন্দে প্রত্যাবর্তন করা; তাই তার যাত্রা সুরু হয় নীচে অবিদ্যা থেকে, যেখানে মন জড় দেহাশ্রিত, যেখানে স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনার কারাগারে রুদ্ধ মনীষী ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করছেন। এই কারারুদ্ধ মনীষীই মানব, 'মনু'।

মৃত্যু ও বিভাজন থেকে আরম্ভ করে তাকে অমরত্ব ও একত্বে উপনীত হতে হয়। তাকে ব্যষ্টি সত্তার মধ্যে বিশ্বসত্তাকে, সাপেক্ষজগতের মধ্যে অনন্যসাপেক্ষকে উপলব্ধি করতে হয়। মানবই ব্রহ্ম, যিনি বিষয়ের বহুত্বের মধ্যে ক্রমশঃ বেশী আত্মসচেতন হচ্ছেন। বিশ্বে মানুষই 'অহং', যা সর্বময় ও সর্বাতীতরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করছে।

বিদ্যা ও অবিদ্যা

বিদ্যা অবিদ্যা, একত্বের চেতনা ও বহুত্বের চেতনা, এই দুই উপাধি অবলম্বন করে' সব অভিব্যক্তি সাধিত হয়। মায়ার, ব্রহ্মের সৃষ্টিপর আত্মবিভাবনার, এই হল দুইটিরূপ।

একত্ব হল নিত্য ও মৌলিক সত্য, একত্ব ব্যতীত বহুত্ব অসৎ হত, একটা অসম্ভব বিভ্রম হত। তাই একত্বের চেতনাকে 'বিদ্যা' বা জ্ঞান বলা হয়।

বহুত্ব হল পরম অদ্বয়ের লীলা বা নানাভাবে আত্মবিস্তার, তার উপাধিসব পরিবর্তনশীল, তার আত্মদর্শন বিভাজ্য; তাই তার বলে পরম বিশ্বজগতে যুগপৎ চেতনার বহুকেন্দ্রে অধিষ্ঠান করেন, শক্তিও বহু বিগ্রহে বাস করেন। একত্বের মধ্যে বহুত্ব হয় ব্যক্ত না হয় প্রচ্ছন্ন থাকে। বহুত্ব ব্যতীত একত্ব অনস্তিত্বের শূন্য হত অথবা নির্বিশেষ আত্মসমাহৃতিতে বা স্থির নিবৃত্তির অবস্থাতে অক্ষর ও বন্ধ্যাভাবে সীমাবদ্ধ থাকত।

কিন্তু স্বকীয় স্বরূপ-একত্বের সত্যজ্ঞান থেকে বিযুক্ত হ'লে বহুত্ব-চেতনা হয় মন ও মোহের অবস্থা ; আর এই হল বিভিন্ন বিগ্রহের ও সসীম ক্রিয়ার সঙ্গে একাত্ম, বিভক্ত অহংএর দৃষ্টি-ভঙ্গী। মানুষের মধ্যে বহুত্বের চেতনা এই রূপ নেয়। সুতরাং তাকে 'অবিদ্যা' বা অজ্ঞান বলা হয়।

ব্রহ্ম মহেশ্বর, তিনি এক ও সর্বানন্দময় কিন্তু তাঁর একত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত ; সর্বশক্তি-মান তিনি, বহুকেন্দ্রে অবস্থিত থেকে নিজেকে বহু বিগ্রহে বিভাবিত করতে পারেন, সেসব থেকে এবং সেসবের উপরে বহুবিধ শক্তির স্রোত প্রবাহিত হয়, সেসবকে মানবা মনের কাজ বা খেলা বলে দেখি। এভাবে বহুরূপে বিভাবিত হ'য়েও তিনি তাঁর বহুত্বের দ্বারা অবরুদ্ধ হন না, পরন্তু সব নানাত্বের মধ্যেও তাঁর স্বীয় একত্বে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকেন। বিদ্যা-অবিদ্যা উভয়ের তিনি প্রভু, এ তাঁর মায়া বা আত্ম-বিভাবনের দুদিক, তাঁর চিৎশক্তির গুণের সামর্থ্য।

ব্রহ্ম 'ঈশ' : তাঁর মায়ার লীলাতেই অধিষ্ঠিত হন বা মায়াতীত ভাবেই অবস্থান করুন, তিনি নিত্যই সে মায়ার প্রভু, স্বতন্ত্র। মানব সে লীলার মধ্যে বাস করে, সে 'অনীশ' : প্রভু নয়, মুক্ত নয়, অবিদ্যার অধীন। কিন্তু এ অধীনতা ও অজ্ঞানের একটা খেলা, পরমার্থতঃ মিথ্যা —সত্য শুধু সাবহারে, যাহা ব্যাপারের সব সম্বন্ধে, দিব্য চিৎশক্তির ক্রিয়ার ক্রমবিকাশে। তার স্বরূপগত সত্য হল মুক্তি, তা ফিরে পেতে হলে তাকে ব্রহ্মচেতনা, বা ঈশ্বরচেতনা পরম একত্বের বোধ পুনরর্জন করতে হবে, ব্রহ্মের মধ্যে ও মহেশ্বরের সঙ্গে একাত্মত্ব উপলব্ধি করতে হবে। এই মুক্তি অর্জিত হলে এবং সে নিজেই যে অক্ষর পরম সত্তা ('সোঽহং') তাঁর সম্ভূতি এই সর্বভূতের সঙ্গে একাত্মত্ব উপলব্ধি হলে', বিশ্বে সে ভাগবত কর্ম করতে সক্ষম হয়, অজ্ঞানের অধীন আর থাকে না, কারণ সেই পরমজ্ঞানের গুণে সে মুক্ত হয়েছে।

সুতরাং মানবের পরিপূর্ণতা হল বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে পরম সঙ্গতির সাধানে ব্যষ্টি সত্তাতে ভগবানের পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাতে বহুত্ব তার একত্বের জ্ঞান লাভ করবে, একত্ব বহুত্বকে আলিঙ্গন করবে।

চরম পন্থা

বিদ্যা অবিদ্যার কোন একটাকে অনুসরণ করে' বিশ্বে মহেশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ করা যায় না। যারা কেবলমাত্র বহুত্ব ও বিভাজনতত্ত্বকে উপাসনা করে' তাদের প্রগতির মুখ একত্ব থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, তারা অন্ধতামসে প্রবেশ করে। কারণ, সে তত্ত্বের প্রবৃত্তিই হল ক্রমবর্ধমান সঙ্কোচন ও সীমাবদ্ধন, অর্জিত জ্ঞানের ক্রমশঃ লোপ এবং প্রকৃতির যান্ত্রিক আবশ্যকতার ও পরিশেষে তার বিভেদী ও আত্মবিনাশা শক্তির ক্রমশঃ বেশী অধীনতা।

একত্বের অভিমুখে প্রগতি থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবার অর্থ হয় আলোক ও অস্তিত্বের প্রতি বিমুখ হওয়া।

যারা মাত্র নির্বিশেষ একত্বতত্ত্বের উপাসনা করে' ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রত্যাখ্যান করে, তারা জ্ঞান ও পূর্ণতা প্রত্যাখ্যান করে এবং, মনে হয় যেন, গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। চেতনার পরিবর্তনকেই তাদের মনে হয় যেন চেতনার উৎক্রমণের লক্ষণ, তাই একটা বিশেষ অবস্থাতে প্রবেশ করে' তাকেই তার সগুণ বলে মনে করে। জ্ঞানের দ্বারা এককে নির্বাচন করে' তারা বহুকে অবজ্ঞা করে, অন্যেরা যেমন মনের দ্বারা বাধ্য হয়ে অজ্ঞান থাকে। সব অতিক্রম করে যাবার উদ্দেশ্যে সব জানাই হল বিদ্যার প্রকৃত পথ।

অপর অবস্থাটির চেয়ে উচ্চতর হলেও এ পরম নিশাকে বৃহত্তর অন্ধকার বলা হয়েছে, কারণ নিম্নতর শৃঙ্খলাহীন অবস্থা থেকে আবার সুসঙ্গতি বিধান করা সর্বদাই সম্ভবপর ; কিন্তু উচ্চতরটি হল শূন্য বা অসতের ধারণা এবং পরাজ্ঞানের অনস্তিত্বের উপরে আসক্তি থেকে পরাজ্ঞানের পরিপূর্ণতায় প্রত্যাবর্তন করা সবচেয়ে কষ্টসাধ্য।

পথদ্বয়ের লাভ

কথঞ্চিৎ কম একান্তভাবে আসক্ত হয়ে অনুসরণ করলে দুপথেই মানবাত্মার বিহিত ফললাভ হয় ; কিন্তু তার কোনটাই বিশ্ব-অভিব্যক্তিতে ব্যষ্টিসত্তার পরম বা সগুণ ব্রত নয়।

বিদ্যার দ্বারা উপনীত হওয়া যায় শান্ত ব্রহ্মে বা অক্ষর পুরুষে, যিনি বিশ্ব ব্যাপারে কোন সক্রিয় অংশ না নিয়ে তা দর্শন করেন মাত্র, অথবা তাঁর পরমসত্তে, আত্ম-অভিনিবিষ্ট চিত্তের অবস্থাতে, যা থেকে বিশ্ব উৎসারিত হয় এবং আবার যাতে প্রত্যাবর্তন করে। উভয় অবস্থাতেই লাভ হয় শান্তভাব, প্রাচুর্য, বিশ্বের দুঃখ-বিভ্রম থেকে মুক্তি।

কিন্তু মানবের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হল আত্মচরিতার্থতা, তবে জগৎ-গতিতে পৃথক ব্যষ্টিরূপে নয় অথবা জগৎ থেকে বিযুক্ত হয়ে পরম নৈঃশব্দ্যে নয়, পুরুষোত্তমে বা মহেশ্বরে, যিনি ক্ষর অক্ষর উভয়কে নিজের সত্তার অভিব্যক্তির বিভিন্ন ধারারূপে নিজের মধ্যে ধারণ করে আছেন। সেই সর্বোত্তম এক সর্বাত্মাকে নিজের ব্যষ্টি সত্তাতে এবং বিশ্বের জন্য উপলব্ধি করবার উদ্দেশ্যেই মানবদেহী বা জীবাত্মা এখানে এসেছে। আর সেই পরম চরিতার্থতার প্রথম সোপানরূপে, বিশ্বে ব্যষ্টির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যন্ত্ররূপে, অবিদ্যাসৃষ্ট অহংএর প্রয়োজন।

অবিদ্যা দ্বারাও শক্তি, সুখ, জাগতিক জ্ঞান ও সত্তার প্রসারে একপ্রকার পূর্ণতা লাভ করা যায়, আর সেই হল অসুরদের বা দেবতাদের, ইন্দ্র-প্রজাপতির অর্জিত পূর্ণতা। সে পূর্ণতা অর্জনের পথ হল, বহুত্বের সকল সম্ভাবনা উদারভাবে স্বীকার করে' এবং বিশ্ব তাকে যা কিছু দিতে পারে সে সব সামগ্রী গ্রহণ করে', ব্যষ্টি সম্পদ অবিরাম বৃদ্ধি করে' নিজেকে

ক্রমশঃ প্রসারিত করা। কিন্তু তাও মানবের লক্ষ্য নয়, কারণ তাতে সাধারণ মানবের সীমা অতিক্রম করা যায় বটে কিন্তু বস্তুপ্রভুর অন্তঃপ্রবিষ্ট দিব্য বিশ্বাতীত অবস্থা আসে না। তাতে অজ্ঞানের বিভ্রম অতিক্রম করা হয় বটে কিন্তু জ্ঞানের সীমা নয়, দেহের মৃত্যু অতিক্রম করা হয় কিন্তু সত্তার সীমা নয়, দুঃখের অধীনতা অতিক্রম করা হয় কিন্তু সুখের নয়, নিম্নতর প্রকৃতিকে অতিক্রম করা হয়, উর্ধ্বতরকে নয়। প্রকৃত মুক্তি ও পূর্ণ অবস্থা লাভ করতে হলে, যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে সে সবে আবার অবতরণ করতে হবে, মৃত্যু-দুঃখ-অজ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।

প্রকৃত জ্ঞান হল ব্রহ্মকে সমগ্রভাবে অনুভব করা, সাগ্রহে এক চেতনা ছেড়ে অন্য চেতনা অনুসরণ না করা, অবিদ্যার চেয়ে বিদ্যাতে বেশী আসক্ত না হওয়া। এ জ্ঞান ছিল প্রাচীন ঋষিদের; তাঁরা 'ধীরাঃ', তাঁদের মনের স্থির দৃষ্টি ছিল, যে কোন এক আকর্ষণে পূর্ণ জ্ঞান থেকে তাঁরা ভ্রষ্ট হন নি, সুতরাং তাঁদের ব্রহ্ম-অনুভূতি ছিল সমগ্র ও সর্বগ্রাহী আর সে অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাও ছিল সমানভাবেই সমগ্র ও সর্বগ্রাহী ('বিচচক্ষিরে')। এই সব প্রাচীন ঋষিদের কাছ থেকে লব্ধ বিদ্যাই এ উপনিষদে বিবৃত হয়েছে।

সমগ্র পথ

বিদ্যা অবিদ্যা উভয়ই ব্রহ্মের অভিব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত এবং অভিব্যক্তিতে উভয়েরই স্থান আছে, কারণ তার অস্তিত্ব ও সার্থকতার জন্য দুইএরই প্রয়োজন আছে। অবিদ্যা বর্তমান থাকতে পারে বিদ্যায় আশ্রিত ও অন্তর্ভুক্ত রূপে—মহৎ একত্ব লাভের উদ্দেশ্যে জীবের প্রস্তুতি ও অগ্রগতির জন্য অবিদ্যার উপর বিদ্যাকে নির্ভর করতে হয়। এর কোন একটিকে ছেড়ে অন্যটি থাকতে পারত না, কারণ কোনও একটির লোপ হলে অন্যটিও অবসিত হয়ে এমন কিছুতে পরিবর্তিত হত যা তার কোনটিই নয়, যা অচিন্ত্য এবং সব অভিব্যক্তির ওপারে, যা অনির্বচনীয়।

নিকৃষ্টতম অজ্ঞানেও কিছু না কিছু জ্ঞান আছে আর তাতেই অজ্ঞানের সে আকার নিরূপিত হয়, একত্বের কিছু না কিছু আশ্রয় আছে আর তাতেই চরম বিভাজন, সীমাবদ্ধন ও অন্ধকারের অবস্থাতেও, শূন্যে বিলীন হয়ে তার অস্তিত্ব লোপ হওয়া নিবারিত হয়। অজ্ঞানের নিয়তি অস্তিত্বের বাহিরে লয়প্রাপ্ত হওয়া নয়, বরং তার সব উপাদানের জ্ঞানে উদ্ভাসিত ও একীভূত হওয়া এবং সে সবের মধ্য দিয়ে যা প্রকাশের প্রয়াস করা হয়েছে তা প্রকাশিত ও সংসাধিত হওয়া এবং সেই সংসিদ্ধিতেই সে সবের পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হওয়া।

জ্ঞান যে চরমতম একত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম তাতে বহুত্বের সব উপকরণ অন্তর্নিহিত ও প্রচ্ছন্ন থাকে, কর্মপ্রবৃত্তিতে যে কোন মুহূর্তে সে সব নির্গত হতে পারে। অবিদ্যার যেন

কখনই অভিব্যক্ত হওয়া উচিত ছিল না এভাবে তাকে ধ্বংস করা বিদ্যার কাজ নয়, কিন্তু অবিদ্যার তাকে নিজের অভিমুখে আকর্ষণ করা, সর্বক্ষণ তাকে আশ্রয় দেওয়া এবং—অজ্ঞানের যা স্বভাব, তার অজ্ঞান নাম যেজন্য হয়েছে—স্বরূপ একত্বের বিস্মৃতি থেকে অব্যাহতি লাভ করতে তাকে সাহায্য করা।

ক্রমশঃ বেশী করে বিদ্যাভিমুখী হবার ফলে অবিদ্যা যখন সার্থক হয় তখন ব্যক্তি ও বিশ্বের পক্ষে স্ব-স্বরূপে অবস্থিত বা তা হওয়া সম্ভবপর হয়ঃ নিজের প্রকাশ সম্বন্ধে সজ্ঞান অপ্রকাশ সম্বন্ধেও সচেতন, জন্মেও মুক্ত জন্মরাহিত্যেও মুক্ত।

প্রগতির যে বিন্দুতে বিশ্বের বহুত্বের মধ্যে এই বিদ্যাভিমুখিতা ও সার্থকতা সজ্ঞানে সাধন করবার ক্ষমতা আসে তা সূচিত হয় মানবে। তার স্বাভাবিক সার্থকতা এই সমগ্র পথ অনুসরণ করেই লাভ হয়—যেপথে অবিদ্যা বিদ্যার কাছে, বহুত্ব একত্বের কাছে, অহং সর্বময় ও সর্বাতীত পরম অস্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে, এবং যে পথে বিদ্যা অবিদ্যাকে অঙ্গীকার করে, একত্ব বহুত্বকে সার্থক করে এবং পরম অস্তিত্বের কোন আবরণ না রেখে বিশ্বে ও ব্যষ্টিতে নিজেকে অভিব্যক্ত করেন।

মর্ত্যভাব ও অমরত্ব :

মর্ত্যভাব

অবিদ্যা সার্থকতা প্রাপ্ত হলে মানব মৃত্যু অতিক্রম করে, কিন্তু নিজের মধ্যে অবিদ্যাকে অঙ্গীকার করলে সে অমরত্ব উপভোগ করে।

মৃত্যুর অর্থ, মর্ত্য অবস্থা : সুখদুঃখ, শুভাশুভ, সত্যমিথ্যা, রাগদ্বেষ, হর্ষবেদনা, এই সব দ্বৈতে আবদ্ধ সসীম অহংরূপে অবিদ্যার জন্মমৃত্যুর অধীনতা।

এ অবস্থা আসে সীমাবদ্ধন ও আত্মবিভাজনের দ্বারা সর্বময় সর্বাত্মধারী ও সর্বাতীত পরম অস্তিত্বের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য এবং দেশকালের ক্ষেত্রে দেহমনপ্রাণের একটিমাত্র বিগ্রহের সঙ্গে আত্মবোধের প্রতি আসক্তির জন্য ; কারণ, সেই হেতুতেই পরমাত্মন্ প্রকৃত পক্ষে যা সে-সবই তাঁর দৃষ্টি থেকে বহিষ্কার করে' গ্রহণ করেন মাত্র একটি বিশেষ কেন্দ্রের মধ্যে এবং সেই কেন্দ্র থেকে বাহিরে প্রবহমান অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং মাত্র একটি দেহপ্রাণমনের আধারের সামর্থ্যের দ্বারা সীমিত অভিজ্ঞতার সমষ্টি। অভিজ্ঞতার সেই সমষ্টি মনের অন্তঃস্থিত অহংকেন্দ্রের চারিদিকে সুব্যবস্থিত করে' এবং, অপ্রবৃত্তিতে নিষ্ক্রিয় ও কর্মপ্রবৃত্তিতে সক্রিয়, স্মৃতি শক্তির এই দ্বিদল ক্রিয়ার দ্বারা কালপ্রবাহের সঙ্গে গ্রথিত করে' সে ব্যষ্টি-আত্মা অবিদ্যার বলে, 'এই আমি'।

তার ফল হয় যে, প্রকৃতির বা চিৎশক্তির লীলার মাত্র একটা বিশেষ অংশকে জীব নিজের আত্মা বলে গ্রহণ করে, সুতরাং চেতনার শক্তির মাত্র একটা বিশেষ সংকীর্ণ অংশ নিজস্ব বলে

অস্বীকার করতে পারে ; আর জীব যা অনাত্ম বলে' মনে করে, বাহ্যবলের প্রবাহ বলে বোধ করে, সে সবের অভিঘাতের সম্মুখীন তাকে হতে হয় সেই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে। সে সবের বিরুদ্ধে সে তার ব্যষ্টি সত্তাকে প্রকৃতির মধ্যে বিলয় বা প্রকৃতির আধিপত্য থেকে রক্ষা করে। সে চেষ্টা করে যে, ব্যষ্টি বিগ্রহে বাস করে' এবং তাকে অবলম্বন করে' নিজের অন্তর্নিহিত 'ঈশ' বা মহেশ্বরের স্বভাবসিদ্ধ অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, নিজের জগৎ ভোগদখল করবে

কিন্তু, অহংএর সংজ্ঞা থেকেই বোঝা যায় যে, তার সামর্থ্য সীমাবদ্ধ। প্রকৃতির গতি দিয়ে গড়া যে বিগ্রহকে সে অহং বলে অঙ্গীকার করছে, সংকৃতির সাধারণ প্রবাহের মধ্যে তা স্থায়ী হতে পারে না। সে গতির একটা প্রক্রিয়ার দ্বারা তাকে তার বিগ্রহ গড়ে নিতে হয়—সেই জনন ; আর একটা প্রক্রিয়ার দ্বারা সে বিগ্রহের বিলয় সাধন করতে হয়—সেই মৃত্যু।

নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার যে অংশের সে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে, মাত্র ততটাই সে তার বুদ্ধি দিয়ে আয়ত্ত করতে পারে ; আর সেসব আয়ত্ত করবার পদ্ধতিও তার অপূর্ণ ও ভ্রমাত্মক, কারণ সমগ্রদৃষ্টি বা সর্বময়ের দৃষ্টি তার নাই। সে যা জানে তা ভ্রমাত্মক আর বাকী যা, তা সে উপেক্ষা করে।

তার অভিজ্ঞতার মধ্যে মাত্র কয়েকটির সঙ্গে সে নিজেকে মেলাতে পারে, অতি অল্প-সংখ্যকই সে গ্রহণ করতে পারে, শুধুমাত্র এই হেতুতে যে মাত্র সেই ক'টিকেই সে আত্মসাৎ করবার মত ক'রে বুঝেছে। তাতেই তার সুখ, বাকী সবই তার কাছে হয় দুঃখজনক না হয় আকর্ষণহীন।

বাহ্য অন্যান্যশক্তির মধ্যে মাত্র ওটি কতকের সঙ্গে সে তার দেহ-প্রাণ-মনে অধিষ্ঠিত শক্তির সামঞ্জস্য সাধন করতে পারে। তাতেই সে সুখ পায়, আর সবেই তার বেদনা বা ঔদাসীন্য।

সুতরাং, মৃত্যু হল দেহ-প্রাণ-মনের যে ব্যষ্টি বিগ্রহের মধ্যে অহং নিজেকে সীমাবদ্ধ করে, সর্বময়ের দ্বারা তার অবিরাম অস্বীকার। ভ্রম হল অল্পজ্ঞানকে যথেষ্ট মনে করে' সে মিথ্যা ধারণাতে অহং যে তৃপ্ত থাকে, সর্বময়ের দ্বারা তার অবিরাম অস্বীকার। দেহমনের ক্লেশ হল সার্বজনীন আনন্দকে সীমাবদ্ধ ও একাধিকৃত করে নিজস্ব সম্ভোগের মিথ্যা ও স্বার্থপর আকারে আবদ্ধ রাখতে অহং যে চেষ্টা করে, সর্বময়ের দ্বারা তার অবিরাম অস্বীকার।

সর্বময়ের সঙ্গে একাত্মত্ব অঙ্গীকার করেই, ব্যষ্টিজীব প্রয়োজনীয় এই অবিরাম অস্বীকার থেকে মুক্ত হয়ে ওপারে উপনীত হতে পারে। তখন সর্ব-সত্তা, সর্ব-শক্তি, সর্ব-চেতনা, সর্ব-সত্য ও সর্ব-আনন্দ ব্যষ্টিজীবকে অধিকার করেন, তৎস্বরূপ মরত্বকে অমরত্বে রূপান্তরিত করেন।

মরণ ও অবিদ্যা

কিন্তু ব্যষ্টি বিগ্রহকে স্বয়ং প্রকৃতিপ্রবাহে বিলীন করা অথবা প্রকৃতি যাঁর অভিব্যক্তি সেই সর্বাত্মাতে বিলীন করা অমৃতত্ব অর্জনের পথ নয়। বিশ্বকে অতিক্রম করে' যিনি তাকে সার্থক করেন তাঁর অভিমুখে হয় মানব-প্রগতি। সে-অতিক্রান্তির ও সে-সার্থকতার জন্য মানবের ব্যষ্টি জীবনকে প্রস্তুত করতে হবে।

অবিদ্যা মরণের হেতু হলেও, মরণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবারও পথ। প্রকৃতি-প্রবাহের প্রতিকূলে ব্যষ্টি সত্তা আত্মপ্রতিষ্ঠা করে' পরিণামে তাকে অতিক্রম, অধিকার ও রূপান্তরিত করবে বলেই ত সীমার বন্ধন সৃষ্ট হয়েছে।

সুতরাং, মানবের প্রথম প্রয়োজন হল অহংএর সীমার মধ্যেই অবিরাম সত্তার জ্ঞানে জ্ঞানলে ও শক্তিতে আত্মপ্রসার বৃদ্ধি করা, যাতে ক্রমশঃ সে তার বৃহত্তর সত্তার ধারণাতে উপনীত হতে পারে—যে-সত্তা এই সব অবলম্বন করে', নিজে ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে তার মধ্যে অভিব্যক্ত হয়ে, প্রকৃতির বাধা প্রতিরোধ করবার শক্তি তার বাড়িয়ে দিয়েছে এবং ব্যষ্টি-বিগ্রহে অজ্ঞান-দুঃখ-অক্ষমতার ব্যাপারগুলিকে জ্ঞান-আনন্দ-সামর্থ্যের রূপে পরিবর্তিত করবার, এমন কি মৃত্যুকেও বিশালতর জীবনের উপায়রূপে পরিণত করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে।

অতএব এই আত্মপ্রসারের ফলে তার বোধ জাগা চাই যে, সে বিস্তৃতির অতিশায়ী, তার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির অতিশায়ী আর কিছু আছে। মানুষকে নিজের আত্মার ধারণা এতটা প্রসারিত করতে হবে যাতে সে সর্বভূতকে নিজের মধ্যে ও সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে দেখে (শ্লোক ৬)। তাকে দেখতে হবে যে, এই 'আমি', যা সবের আধার ও সবের আশ্রয়, সে-ই পরম অদ্বিতীয়, সে-ই বিশ্বময়, তার ব্যক্তিগত অহং নয়। তার অহংকে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে হবে, তার স্বভাবে তাঁকে প্রতিরূপিত করে' তাঁতেই পরিণত হতে হবে, সব রূপে ও বৃত্তিতে আত্মার সমতা নিয়ে তাঁকে লাভ ও উপভোগ করতে হবে।

তাকে দেখতে হবে যে, এই এক বিশ্বময় সর্বথা বিশ্বাতীত, তিনিই অক্ষর পরম-সত্তা, যে, এই বিশ্ব এবং বিশ্বের সব রূপ, সব ক্রিয়া ও সব ব্যষ্টিসত্তা সেই পরমেরই সম্ভূতি (শ্লোক ৭)। বিশ্ব একটা সম্ভূতি; দেশকালের গতিতে, দেহ-প্রাণ-মনের ক্রমপরিণতিতে অবিরাম যে সম্ভূতি যাঁকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে তিনি সব সম্ভূতির অতীত, সব দেশ-কালের সব দেহ-প্রাণ-মনের অতীত।

এই ভাবে বিদ্যা-অবিদ্যার একত্ব হয়। অবিদ্যার দ্বারা লোকে মৃত্যু-দুঃখ-অজ্ঞান-অক্ষমতা অতিক্রম করে—মানব অস্তিত্বের প্রথম ব্যাবহারিক সংজ্ঞা সে-সব, বহুত্বের

সীমাবদ্ধন ও বিভাজনের মধ্যে পরমের আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জন্মের উপর তার প্রথম দাবী। বিদ্যার দ্বারা, জন্ম নিয়েই লোকে অমরত্ব লাভ করে।

অমরত্ব

অমরত্বের অর্থ দেহ বিলয়ের পরে আত্মার না অহং-এর ঊর্ধ্বতন নয়। দেহ বিলয়ের পরে আত্মা বর্তমান থাকেই, কারণ দেহ-জন্মের পূর্বেও সে বর্তমান ছিল। আত্মা অজ, অমর। মৃত্যুর পরে অহং-এর বর্তমান থাকা একটা প্রাথমিক অবস্থা—তার দ্বারা ব্যষ্টি জীব অবিদ্যার ক্ষেত্রে তার সব অভিজ্ঞতা ক্রমানুয়ে চালিত করতে ও একসূত্রে গ্রথিত করে' নিতে পারে, যাতে ক্রমশঃ বেশী আত্মস্থ হবে, বেশী প্রভুত্বের সঙ্গে, আত্মপ্রসারণের যে পদ্ধতি পরিশেষে বিদ্যাতে পরিণত হবে তা অনুসরণ করে' যেতে পারে।

অমরত্বের অর্থ যে চেতনা জন্মমৃত্যুর অতীত, কার্যকারণ শৃঙ্খলের অতীত, সব বন্ধন ও সীমার অতীত, মুক্ত, আনন্দময়, সচেতন সত্তাতে স্বপ্রতিষ্ঠ—মহেশ্বরের, পরমপুরুষের, সচ্চিদানন্দের চেতনা।

অমরত্ব ও জন্ম

মানব এই উপলব্ধির উপর বিশ্বে মুক্ত ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

কিন্তু তা অধিগত হলে, জীবের পক্ষে জন্ম না কর্মের আর কি প্রয়োজন থাকে? নিজের জন্য কিছু থাকে না, কিন্তু ভগবান ও বিশ্বের জন্য সম্পূর্ণই থাকে।

বিশ্বাতীত অমরত্ব বিশ্ব অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য নয়, কারণ সে অমরত্ব পরমাত্মার নিত্য-অধিগত। মানব অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হল, যেন তার মধ্য দিয়ে পরমাত্মা যেমন অসম্ভূতিতে তেমনি জন্মেও অমরত্ব উপভোগ করতে পারেন।

ব্যক্তিগত মোক্ষও শেষ কথা নয়, কারণ সে ত শুধু অহং-এর চরম পরিতৃপ্তি, মহেশ্বরের আশ্রয়ে সবের মধ্যে তার আত্ম-উপলব্ধি নয়।

নিজের অমরত্ব অর্জন করবার পরেও মুক্তজীবের বিশ্বে ভগবানের কাজ করবার আছে। সব জীবের দেহ-প্রাণ-মনকে ক্রমশঃ বেশী করে', নতাভাব নয়, অমরত্ব অভিব্যক্ত করতে সাহায্য করতে হবে।

স্থূল দেহ ধারণ করে' (যাকে আমরা জন্ম বলি) সে কাজ সে করতে পারে, আবার অপর কোনও লোকে কোনও ভাবে স্থিতিলাভ করে,' এমনকি (তাও সম্ভবপর) বিশ্বের ওপার থেকেও তা সাধন করতে পারে। কিন্তু দেহে জন্মগ্রহণই হল জন্মপ্রগতিতে নিম্নতম অজ্ঞানলোকে যারা এখনও আবদ্ধ আছে, মুক্ত জীব তাদের যে সাহায্য করতে পারে তার সবচেয়ে সন্নিহিত, দিব্য ও আশু ফলপ্রদ উপায়।

সম্ভূতি ও অসম্ভূতি

প্রকৃতির বাহিরে আত্মনের কোন বিবর্তন হয় না, তা অব্যয় ও নিত্য। প্রকৃতিতে অবস্থিত পরমাত্মার বিবর্তন হয়, তার অবস্থার ও রূপের পরিবর্তন হয়। প্রকৃতিতে জন্ম হল কালের ক্রমগতিতে বিশিষ্টরূপ ও অবস্থাতে প্রবেশ করা।

পরমাত্মার এই দুই বিভাব আছে : প্রকৃতির অভ্যন্তরে ও প্রকৃতির বাহিরে, জগতের গতির সঙ্গে চলমান ও সে গতির উর্ধ্বে আসীন, জীবনবৃক্ষের পরিণতিতে সক্রিয় ও তার ফলাশা অথবা নিষ্ক্রিয় সাক্ষী মাত্র ; সুতরাং মানবাত্মার পক্ষেও সচেতন অস্তিত্বের পরস্পর একান্ত বিরোধী দুইটি অবস্থা সম্ভবপর : জন্মের অবস্থা ও জন্মরহিত অবস্থা।

জন্মের বিকৃত অবস্থা থেকে যাত্রা আরম্ভ করে', মানব সংসৃতি থেকে মুক্ত হয়ে সচেতন অস্তিত্বের শাশ্বতস্থিতিতে উপনীত হয়—তাকেই জন্মরাহিত্য বলা হয়। জন্মের গ্রন্থি হল অহংবোধ, এই অহংবোধের বিলয়ই আমাদের জন্মরহিত ভাবে নিয়ে যায়। সেইজন্য সে ভাবকে 'বিনাশ'ও বলা হয়।

স্বরূপতঃ জন্ম ও জন্মরাহিত্য স্থূল দৈহিক অবস্থা নয়, আত্মিক অবস্থা। অহংবোধের গ্রন্থি ভেদ করে'ও লোকে স্থূল দেহে অবস্থান করতে পারে ; কিন্তু শুদ্ধমাত্র অহংবিনাশের উপরই যদি সে অভিনিবিষ্ট হয়, তাহলে তার আবার দেহে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। প্রকৃতির যে উপস্থিত প্রবেগ দেহধারণের কাজ চালিত করে, সে প্রারব্ধ ক্ষয় হলেই জন্ম থেকে তার মুক্তি হয়। অপরপক্ষে, জন্মে যদি সে আসক্ত থাকে, তাহলে তার অন্তরের অহংতত্ত্ব অবিরত নূতন মন ও দেহের আকারে নিজেকে আবৃত করতে চেষ্টা করে।

চরমপন্থার অশুভ ফল

জন্ম বা জন্মরাহিত্য, কোন ভাবে আসক্তিই শ্রেষ্ঠ পথ নয়। কারণ আসক্তি মাত্রেই অজ্ঞানের ক্রিয়া, সত্যের উপর অত্যাচার। তার পরিণামও অজ্ঞান অন্ধতামস অবস্থা।

জন্মরাহিত্যে ঐকান্তিক আসক্তির ফলে নির্বিশেষ প্রকৃতিতে বা নাস্তিত্বে, মহাশূন্যে, বিলয় হয় ; যার এ উভয়ই হল অন্ধতামস অবস্থা। কারণ, নাস্তিত্বের প্রয়াস জন্ম নিয়ে অস্তিত্বের অবস্থাকে অতিক্রম করা নয়, তাকে রহিত করা, সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব অতিক্রম করে অসীম অস্তিত্বে যাওয়া নয়, অস্তিত্ব থেকে তার বিপরীতে যাওয়া। আর অস্তিত্বের বিপরীত চেতনা ত হতে পারে শুধু নাস্তিচেতনার রাত্রি—সেও অজ্ঞানের অবস্থা, মোক্ষের নয়।

অপরপক্ষে, দেহে জন্মের প্রতি আসক্তির অর্থ হল অবিরাম নিজেকে সীমা দিয়ে বাঁধা, নিষ্প্রয়োজ্য বা মুক্তির কোন আশা না রেখে অহং-এর নিয়ুতর সব অবস্থাতে অহংভাবিত জন্মের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি। বিশেষ একটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ অবস্থাকে অপর

অবস্থার চেয়ে গভীরতর অন্ধকারময় বলে মনে হয়, কারণ মুক্তির প্রেরণাও তার অজ্ঞাত। সত্তা অবধারণে প্রশ্ন নয়, এ হল অন্ধ অবস্থাতে চিরকাল সন্তুষ্ট থাকা। পরিণামেও তাতে বৃহত্তর কোন মঙ্গলে নিয়ে যেতে পারে না, কারণ উচ্চতর কোন অবস্থার স্বপ্ন অবধি সে দেখে না।

চরমপন্থার শ্রেয়ঃ

তবে, কথঞ্চিৎ পরস্পরসাপেক্ষ ভাবে অনুসৃত হলে এ প্রবৃত্তিদ্বয়ের প্রত্যেকটি থেকে তার নিজস্ব পরিণাম, নিজস্ব শুভফল পাওয়া যায়। সম্ভূতির লক্ষ্যরূপে এবং উচ্চতর পূর্ণতর সত্যতর অস্তিত্বের রূপে অসম্ভূতিকে অনুসরণ করলে, তার ফলে অক্ষর ব্রহ্মে বা অসতের বিশুদ্ধ মুক্তিতে নিবৃত্তি হতে পারে। প্রগতি ও আত্মবিস্তৃতির উপায়রূপে জন্ম অনুসরণ করলে তার ফলে বৃহত্তর পূর্ণতর জীবন লাভ হতে পারে, সে জীবন আবার পরম সিদ্ধির আশ্রয়স্বরূপও হতে পারে।

আদর্শ পথ

কিন্তু এসব ফলের কোনটাই স্বতঃ সম্পূর্ণ নয় বা মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য নয়। একপথের ত্রুটি অন্যপথের দ্বারা পূর্ণ হলেই মানবের পূর্ণ মঙ্গলে প্রত্যেকটি পথের নিজস্ব ঈপ্সিত সিদ্ধি লাভ করা যেতে পারে।

ব্রহ্ম বিদ্যা অবিদ্যা, সম্ভূতি অসম্ভূতি দুই-ই। পরমাত্মাকে অক্ষররূপে উপলব্ধি করা, জন্মমৃত্যুর ওপারে অনন্ত সর্বাতিশয়ী অস্তিত্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা—ব্রাহ্মীস্থিতি—সম্ভূতিতে মুক্ত জীবনের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। প্রত্যেকটির পক্ষে অপরটি আবশ্যক। বিশুদ্ধ অক্ষর ব্রহ্মের অধ্যয়নের ভাগী হলেই জীব সংসারপ্রবাহে নিমজ্জনের হাত থেকে উদ্ধার পায়। এ মুক্তি পেলে সে মহেশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়, তাঁর কাছে সম্ভূতি-অসম্ভূতি নিজের অস্তিত্বের দুই বিভাব মাত্র; সুতরাং অভিব্যক্তির মধ্যেই প্রকৃতির বিষম-চক্রে পিষ্ট না হয়ে সে অমৃতত্ব উপভোগ করতে পারে। তার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বলে জন্মের প্রয়োজন শেষ হয়; কিন্তু সম্ভূতি অঙ্গীকারের স্বাতন্ত্র্য তার থাকে। কারণ, ভগবান যুগপৎ সমানভাবে তাঁর নিত্যতার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভূতির স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করেন।

এমনকি, বলা যেতে পারে যে, সত্তাকেই পূর্ণতম স্বতন্ত্রতম ভাবে পেতে হলে পরম অসতে সত্তার ধারণা পর্যন্ত বিলীন হবার সজ্ঞান অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। পূর্ণসমন্বয়ের দিক থেকে দেখলে, বৌদ্ধধর্মে ভাবাত্মক সত্তার স্বরূপের বিশুদ্ধতম বা ব্যাপকতম প্রত্যয়কেও অতিক্রম করবার যে মহৎ প্রয়াস করা হয়েছিল, এই হল তার তাৎপর্য।

সুতরাং অহংএর প্রতি এবং জন্মের প্রতি আসক্তির বিলয় করে জীব মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়, সব দ্বন্দ্ববোধের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। সে মুক্তজীব সম্ভূতি স্বীকার করে আত্মার অনুগত

ভাবে প্রকৃতির একটা প্রক্রিয়া রূপে, প্রকৃতির অধীন হয়ে নয়; এবং সে মুক্ত ও দিব্য সম্ভূতির দ্বারা সে অমৃতত্ব উপভোগ করে।

জীবনের সমর্থন

এভাবে, উপনিষদের তৃতীয় প্রবাহে জীবনের ও কর্মের প্রয়োজন শিক্ষা দেওয়া হল; দ্বিতীয় শ্লোকে পূর্বেই সন্ন্যাসপন্থীকে সে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কর্ম জীবনের সার। জীবন ব্রহ্মের অভিব্যক্তি; সে অভিব্যক্তির নিবর্তন-বিবর্তনের বিকাশ সাধিত হয় সচেতন সত্তার যে সাতটি তত্ত্বের দ্বারা, ব্রহ্মে তাদের সুসঙ্গতি বিধান করে প্রাণতত্ত্ব। মাতরিশ্বা ব্রহ্মে সব জলরাশির, দিব্য অস্তিত্বের সপ্তধারায় গতির, যথাযথ বিন্যাস করেন।

সে দিব্য অস্তিত্বই মহেশ্বর। বিশ্ব সংস্থিতিতে তিনি সর্বত্র বহির্মুখে গমন করেছেন তাঁর তিনটি বিভাবে:—সব বস্তু-সত্তার সর্বময় দ্রষ্টারূপে, মনের দ্বারা সব সম্ভাবনার নির্দেষ্টারূপে, দৃশ্যমান সব ব্যাপারের স্থূল পরিণতির কর্তারূপে তিনি বিশ্বকে প্রকটিত করেছেন। সবের প্রকৃতি, বিকাশ ও লক্ষ্য অনুসারে, অনাদিকাল থেকে তিনি অমোঘভাবে সব বস্তু নিরূপিত করেছেন।

এই নিরূপণ তাঁর বিদ্যা-অবিদ্যার—স্বরূপ-একত্বের চেতনা ও প্রাতিভাসিক বহুত্বের চেতনা—এই যুগল সামর্থ্যের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

চরম সীমাতে উপনীত হয়ে বহুত্ব পুনরাবর্তিত হয় সজ্ঞান ব্যষ্টি সত্তাতে, যে হল মহেশ্বর; সংসারে সব বিগ্রহে বাস করে তিনি অজ্ঞানের লীলা উপভোগ করেন। পরে, অজ্ঞানের মধ্যে বাস করে আত্মবিকাশের ফলে জীব জ্ঞানের সামর্থ্য ফিরে পায় এবং জ্ঞানের দ্বারা অমরত্ব উপভোগ করে।

সে অমরত্ব অর্জন করা যায় নিত্যমুক্ত, অজ ও অমর, ব্রহ্ম ও মহেশ্বরের চেতনাতে লীন অহং-এর এবং তার জন্মশৃঙ্খলের বিলয় করে। কিন্তু তা ভোগ করতে হয় বিশ্বে দিব্য মুক্ত সম্ভূতির দ্বারা, বিশ্বের বাহিরে নয়; কারণ, সেখানে তা নিত্য অধিগত, কিন্তু এখানে, এই জড়দেহে, দিব্য অন্তর্যামী সত্তাকে সাধনার দ্বারা সে অমরত্ব অর্জন করে উপভোগ করতে হবে আপাতদৃষ্টিতে তার সর্বাপেক্ষা বিপরীত সংজ্ঞাতে, ব্যষ্টিজীবনে এবং বিশ্বের বহুধা চেতনাতে।

জীবন অতিক্রম করতে হবে, যাতে তাকে মুক্তভাবে গ্রহণ করা যায়; বিশ্বে কর্ম উত্তীর্ণ হতে হবে, যাতে সে কর্ম দিব্যভাব সম্পাদিত হতে পারে।

এমন কি, আপাত বন্ধনের মধ্যেও জীব প্রকৃতপক্ষে মুক্ত, বন্ধন তার একটা খেলা বই নয়; কিন্তু মুক্তির চেতনাতে তাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং, এই বস্তু কি ওই বস্তু নয়, বিশ্বজনীনভাবে ভাগবত সত্তাকে, সর্বময়কে লাভ করতে ও উপভোগ করতে হবে।

---

* অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত সেন

শিশুসঙ্গে শ্রীমা

(৬৯নং অধিবেশন, বুধবার, ২৮।৭।৫৪)

প্রশ্ন : যে অহংকার আমাদের ভগবানের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তাকে কি করে তাঁর মধ্যে একেবারে বিলীন করে দেওয়া যায় ?

শ্রীমা : সে জন্যে প্রথমে চাই দৃঢ় সংকল্প, তারপর বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে অনুক্ষণ অন্তরের আকুল প্রার্থনাটিকে জাগিয়ে রাখা, আর চাই, যতবার অহং মাথা চাড়া দেবে, ততবার তার নাকের ডগায় একটি করে থাপ্পড় কষিয়ে দেওয়া, যাতে থাপ্পড় খেয়ে খেয়ে বেচারা হায়রাণ হয়ে গিয়ে রণে ভঙ্গ দেবে। কিন্তু সাধারণত মানুষ ত তা করে না। কোথায় অহংয়ের গালে এক চড় কষিয়ে দেবে, তা না-করে তারা উল্টে তারই মতে সায় দেয়, বলে, "যাই হোক, ও কিন্তু যা বলছে তা ন্যায্য।" আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ত মানুষ জানেই না যে ওটা তার অহং-য়ের কথা। তার বিশ্বাস, ওটা সে নিজেই ভিতর থেকে বলছে। তাই প্রথম কাজ হল, নিজের যথার্থ স্বরূপকে খুঁজে বের করা, অহংকারকে একেবারে আমল না দেওয়া। সবার আগে এ-কথাটা পরিষ্কার করে বুঝতে পারা চাই যে, কোনমতে অহং-কারকে এতটুকুও স্থান দেওয়া চলবে না। তা বটে, কিন্তু ব্যাপারটি অত সোজা নয়। মানুষ মনে মনে স্থির করতে পারে এবং বুকে দিব্যি আওড়াতে পারে, "আমি আর অহং-য়ের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে চাই না, আমি আর ভগবানের থেকে সরে থাকতে চাই না," ইত্যাদি সব কথা। ওগুলি শুনতেও বেশ। কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যেই ওইভাবে খানিকটা নড়াচড়া করে ওরা ওইখানেই থেকে যায়। বাহ্যজীবনের বিবিধ ব্যাপারে তার ফল এমন কিছুই ফলে না। "অহং-কে প্রশ্রয় দেব না" একথা বলার এক মিনিট পরেই দেখা যায় মানুষ আবার সম্পূর্ণ অহংকারের দ্বারা চালিত হয়ে কাজ করে বসে, এবং দিব্যি স্বাভাবিকভাবেই তা হজম করে। তার জন্য একটুও বিড়ম্বিত বোধ করে না।

তাই কথাটার আসল মানে কী, তা সবার আগে বুঝতে চেষ্টা করা দরকার। প্রথম উপায় হল,—অবশ্য তার আবার অনেক ক্রম আছে,—চেষ্টা করা অহংকারী না হবার। ইংরেজীতে দুটি শব্দ আছে, যেগুলির দ্বারা তফাৎটা বেশ পরিষ্কার হয়। এক হল selfish, অর্থাৎ স্বার্থপর, আর অন্যটি হল egoism অর্থাৎ "অহং"-বোধ, দুটি ভিন্ন বস্তু। কিন্তু ফরাসীতে এই পার্থক্যের উপায় নেই, ওদের আছে একটিই শব্দ। ওরা বলবে, "আমি স্বার্থপর হতে চাই না", কিন্তু সেটাও অতি সামান্য বস্তু। লোকেরা যখন স্বার্থপর হওয়া ছেড়ে দেয়, তখন মনে ভাবে যে তারা খুব উঁচুদরের সাধুপুরুষ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ওটা একটা হাসির ব্যাপার। আত্মপর না হওয়াটা অতি সাধারণ কথা। অহংকারী লোক যে কী পরিমাণে হাস্যকর হয় তা তোমরা কল্পনাই করতে পারবে না। দেখবে তারা চব্বিশ ঘণ্টা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, শুধু নিজেদের সুবিধা সুযোগের দিকেই তাদের দৃষ্টি। নিজেদের ভিতরকার ক্ষুদ্র মানুষটিরই তারা আজ্ঞাধীন। তারা ভাবে, যেন তারাই হল এই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র, এবং চেষ্টা করে সমগ্র বিশ্বকে, আর ভগবানকে পর্যন্ত নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে টেনে এনে, নিজেদের মতন করে গড়ে তুলতে, অর্থাৎ যেন ঐটিই হল পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুতর কাজ। মানুষ যদি নিজের এই ছবিটি একবার দেখতে পারত, যেভাবে আয়নাতে সে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে, সেই ভাবে যদি নিজের দৈনন্দিন জীবনের ছবিটি দেখতে পেত, তাহলে দেখত, কী বিকটই না তার নিজের চেহারা, আর কি হাস্যকর তা। হয়ত তাহলে ফল ভালই হত। হঠাৎ তার চেতনা খুলে যেত, সে বুঝতে পারত যে, ব্যাপারটা হচ্ছে নিছক হাসির, যাকে সে অত বড় করে দেখে।

মনে পড়ছে, অনেকদিন আগে রবীন্দ্রনাথের একটি লেখার ফরাসী অনুবাদ পড়েছিলাম। কথাগুলি আমার যে কী ভাল লেগেছিল তা আর কী বলব। বিষয়টি এক কুকুর-বাচ্চাকে নিয়ে, কিছু একটার সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। সেগুলো আমার মনে নেই। তবে ওর মধ্যে যে অংশটা আমাকে মুগ্ধ করেছিল তা হচ্ছে এই : ছোট্ট একটি কুকুর-বাচ্চা, তার গৃহকর্ত্রীর কোলের ওপর বসে আছে, আর ভাবছে যে, সে-ই হল এই বিশ্বের কেন্দ্রস্থল। কথাগুলি সত্যিই আমায় মুগ্ধ করেছিল, কারণ ওটা বাস্তবিকই সত্যি। আমি একটি ছোট্ট কুকুর-বাচ্চাকে জানতাম, সে ছিল ঠিক ওই ধরণের। কিন্তু ওরকমের আরও অনেক আছে, সম্ভবত সবগুলিই ওই এক রকমের। ওরা চায়, সবাই ওদের নিয়েই ব্যস্ত থাকুক। আর সত্যিই, ওরা যেটি চায় ঘটেও ঠিক তাই। কারণ তোমরা ভাল করেই জান যে, একটি ছোট্ট কুকুর-বাচ্চাকে যদি পেলে, বা একটি ছোট শিশুকে যদি পেলে,—ও দুই প্রায় একই ব্যাপার,—ব্যস্, ওমনি সবাই মিলে লেগে গেলে তাকে নিয়ে নাচাতে। তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, যেই এতটুকু একটি শিশু এসে হাজির হল, ওমনি লোকেদের আর সব কাজ মাথায় উঠে গেল। আগে তারা নিজেদের মধ্যে ভাল বিষয় নিয়ে গল্প আলাপ করত, একটু, যাকে বলে, উচ্চচিন্তার বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাত, কিন্তু যেই একটি শিশু মাঝে এসে উপস্থিত হল, ওমনি সবাই মিলে লেগে গেল তার দিকে চেয়ে হাসতে, তাকে হাসাতে, তাকে আদর করতে, তার মুখ দিয়ে কথা বলাতে। শিশুকে কোলে না নিয়ে, টেপাটেপি না করে, লোকেরা থাকতে পারে না। তাকে শান্তভাবে বেড়ে উঠতে দিতে তারা জানে না। ফলে শিশুরও ধারণা হয়ে যায় যে, এই বিশ্বের সে-ই হল কেন্দ্রস্থল। আর এমনটা হওয়াই ত স্বাভাবিক। ছোট্ট কুকুর-বাচ্চার বেলাতেও ওই একই কথা, বিড়াল-বাচ্চার বেলাতেও ওই একই কথা।

মানুষের জীবনের এটা হল এক ধরণের বিকৃতি, খুবই নিম্নস্তরের বস্তু ওটা। নিজের চেয়েও ছোট কিছুকে রক্ষা করবার একটা প্রয়োজনবোধ, এই হল তার মূলে, আর এই-ই হল অহংকারের প্রথম নিরহংকার অভিব্যক্তির একটি রূপ। মানুষ তার নিজের চেয়ে অনেক ছোট, অনেক দুর্বল কোন জীবকে,—যার অস্তিত্ব নির্ভর করছে প্রায় অথবা সম্পূর্ণই তার দয়ার ওপর, আত্মরক্ষার যার কোনই সামর্থ্য নেই, তাকে—রক্ষা করতে, আশ্রয় দিতে, তার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে যখন ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তখনই সে খুব আরাম বোধ করে। তার ধারণা হয় যে, সে নিজে খুব একজন উদারচেতা মহাপ্রাণ লোক, যেহেতু সে উক্ত দুর্বল জীবটিকে সবলে পিষে না ফেলে আশ্রয় দান করেছে। পৃথিবীতে উদারতার এই হল প্রথম প্রকাশ। কিন্তু এ সবের পিছনে কী আছে, যখন মানুষ দেখতে শেখে, যখন একটু উঁচু থেকে ব্যাপারটিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে, তখন আর সে অহংকারের খেলায় সায় দিতে চাইবে না। কারণ এটা সত্যিই হাসির ব্যাপার, ষোল আনাই হাসির ব্যাপার। তার মানে তবে বুঝতে পারছ, ভগবানের মধ্যে নিজের অহংকে নিঃশেষে বিলীন করে দেবার আগে সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হবে। অবশ্যই তাঁর মধ্যে সকল অহংকারকে বিলীন করতে হবে। কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে যে, মানুষ নিজে সম্পূর্ণভাবে স্ব-প্রতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত কি করে সে তার অহংকে ভগবানের মধ্যে বিলীন করে দিতে পারে?

জান কি, কাকে বলে সম্পূর্ণভাবে স্ব-প্রতিষ্ঠ হওয়া?.....

বাইরের কোন প্রভাবই আর যাকে স্পর্শ করতে পারে না, এমন অবস্থা লাভ করা। দিন কয়েক আগে, একজন আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, সাধারণ সাহিত্য, অর্থাৎ নভেল, নাটক প্রভৃতি পড়তে তার আর বড় উৎসাহ নেই, কারণ তার প্রকৃতির একটা বিশেষ দোষ হচ্ছে যে, ওই সব বইয়ের নায়ক নায়িকাদের চরিত্রের ছাপ তার অন্তরে রেখে যায়, আর তার ফলে, ওদের সেই সব চিন্তা, সেই সব ভাবাবেগ তার মধ্যে খেলতে থাকে। তোমাদের ধারণাই নেই যে কত অসংখ্য লোকের ঠিক এই অবস্থা হয়। তারা কোন একটা বই পড়তে পড়তে একেবারে এমনভাবে তারই মধ্যে ডুবে এক হয়ে যায় যে, সেই সব নানারকমের ভাব, চিন্তা, বাসনা, নতলব, কাজের ছক, এমন কি তাদের আদর্শগুলো পর্যন্ত নিজেদের অন্তরে অনুভব করে। বই পড়তে পড়তে এই সব বস্তুগুলি তারা বেমালুম আত্মসাৎ করে, এবং তা যে করে, তা লক্ষ্যই করে না। কারণ পাঠকের স্বভাবের শতকরা নিরেনব্বইই ভাগই হল নরম মাখনের মতন। আঙুল দিয়ে ছুঁলেই তাতে ছাপ পড়ে। আর এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি জিনিসই আঙুলের ছাপের কাজ করছে: কারুর একটা চিন্তা যদি তোমার সামনে প্রকাশ পেল, কিংবা তুমি নিজে পড়লে কোন একটা কথা, বা দেখলে কোন একটা জিনিস, বা লক্ষ্য করলে কেউ একটা কিছু করছে, বা এছাড়াও, তোমার পাশের লোকের মনোভাব প্রভৃতি

যতসব ক্রিয়া, এর প্রত্যেকটি তোমার মধ্যে ঢুকে বসে রয়েছে। যদি দেখার অভ্যাস কর ত স্পষ্ট দেখতে পাবে, প্রত্যেকটি জিনিস জায়গা দখল করেছে তোমার মধ্যে। তারা সেখানে সবাই হুড়োহুড়ি করে তালগোল পাকিয়ে আছে, প্রত্যেকটিই চেষ্টা করছে অন্যগুলোকে ঠেলে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতে, এবং সমস্তক্ষণ তারা ভিতরে বাইরে সংঘর্ষ করছেই করছে, একটা ঢুকছে এদিক দিয়ে, অন্যটা বেরুচ্ছে ওদিক দিয়ে, আবার হয়ত ওটা ঢুকছে, এটা বেরুচ্ছে, এই ধরণের কাণ্ড মানুষের মধ্যে চলেছে অহরহ, ঠিক ইলেক্‌ট্রিক কারেন্টের মতন। তড়িৎ প্রবাহকে যেমন চোখে দেখা যায় না কিন্তু তার অস্তিত্ব ভাল করেই অনুভব করা যায়, তেমনি মানুষের অন্তরে অনুক্ষণ চলেছে দ্বন্দ্ব, অসংখ্য চিন্তার ঝাঁক, প্রত্যেকেই চাইছে নিজেকে প্রকাশ করতে, এবং এই সংঘর্ষে যেটি সবচেয়ে শক্তিমান সেই হয় শেষ পর্যন্ত সফলকাম। কিন্তু এদের সংখ্যা ত আর বড় কম নয়, এরা হল অফুরন্ত ; অথচ মানুষ একা। এই অসংখ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তাকে নাকের জলে চোখের জলে হতে হচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর একটা শুকনো পাতার যে অবস্থা হয়, মানুষের অবস্থাও ঠিক সেই রকম। অনুক্ষণ সেটা ঢেউয়ের চোটে উঠছে, নামছে, হেলছে, দুলছে। একদিন সে ঠিক করলে, এটা করবে। তারপরের দিন মত বদলে গেল, অন্য একটা করবে ভাবা স্থির হল। কোন এক মুহূর্তে প্রবৃত্তির বেগ তাকে ছোটাল এই দিকে, পরক্ষণেই আর একটা মুহূর্ত তাকে ছোটাল ওই দিকে, কখন বা তার দৃষ্টি ফিরল ঊর্ধ্বের দিকে, কখন তা নেমে গেল খাদের নিচে। এই ত চল মানুষের জীবন, অনুক্ষণ যে অভিনয় হয়ে চলেছে।

তাই প্রথমে হতে হবে এক সচেতন সত্তা, যার ভিতরকার উপাদানগুলো হবে সুসংবদ্ধ, সে হবে ব্যক্তিত্ব-মণ্ডিত, স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ, স্বয়ং-চালিত, সংসর্গের সকল প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে-কোন কথাই তার কাণ দিয়ে প্রবেশ করুক, যা-কিছুই সে পড়ুক, যা-কিছুই সে দেখুক, কোনটিই তাকে এতটুকু স্পর্শ করবে না। বাহ্য পরিবেশ থেকে সে গ্রহণ করে মাত্র ততটুকুই যতটুকু সে দরকার মনে করে, এবং যা-কিছুই তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুপযোগী সে-সবকে সে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রচালিতবৎ বর্জন করে, এবং জগতের কোন বস্তুরই ছাপ তার ওপর কোনদিন পড়তে পারে না, যদি না সে নিজে থেকে তা নিতে রাজী হয়। এই রকম যখন হবে, তখনই বুঝতে হবে মানুষ স্ব-প্রতিষ্ঠ হতে আরম্ভ করেছে। এবং এইভাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যখন তার মধ্যে গড়ে উঠেছে তখনই কেবল সে সেটাকে সমর্পণ করতে পারে। কারণ মানুষ যতক্ষণ না কোন বস্তুকে নিজের অধিকারের মধ্যে পাচ্ছে ততক্ষণ সে তা উৎসর্গ করবে কি করে? প্রথমে তাই নিজেকে হতে হবে, তবেই তারপর তুমি নিজেকে দিতে পারবে। তুমি যা, তা যতক্ষণ হয়ে না উঠলে, ততক্ষণ তুমি দেবে কী? কিছুই ত সমর্পণ করতে পারবে না। নিজেকে সমর্পণ করতে পারতে হলে, প্রথমে তোমার অস্তিত্বটাই গড়ে ওঠা

চাই, এবং অস্থিরকে গড়তে গেলে তোমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ আগে হওয়া চাই। আর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আদি ও গোড়ার রূপ হল অহংকার।

ধরো, তোমার দেহটা যদি ওই রকম একটা কঠিন পদার্থ হয়ে গড়ে না উঠত,—মানুষের দেহটা যে কী ভীষণ কঠিন অনমনীয় পদার্থ তা ত সবাই জান—যদি এর সব উপাদানগুলো অতটা শক্ত, আড়ষ্ট না হত, যদি ধরো, তোমার গায়ে ওই চামড়া বলে পদার্থটা,—দেখছ ত, একেবারে যেন নিরেট, মোটেই তরল পদার্থ নয়,—ওটা যদি না থাকত, যদি বাস্তবিক তুমি হতে তোমারই প্রাণের এবং তোমারই মনের অভিব্যক্তি মাত্র, তাহলে তুমি সেই সব জলচর জীব—যাদের গা আঁঠার মতন নরম—তাদের অধম হতে। তাহলে একজনের দেহ আর একজনেরটির সঙ্গে এক হয়ে, তালগোল পাকিয়ে মিশে, একাকার হয়ে যেত। কি বিপর্যয় কাণ্ডই না হত তা হলে বল দেখি! তাই প্রথমেই মানুষের দেহটা পেল একটা খুব কঠিন আকার। লোকে এখন অনুযোগ করে। তারা বলে, "দেহটা বড়ই অচল, বড়ই বেয়াড়া, অতিমাত্রায় আড়ষ্ট, নমনীয়তার নামমাত্র নেই এর মধ্যে। এমন একটা তরল বস্তুর অভাব রয়েছে এর মধ্যে, যেটা থাকলে সে নিজেকে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়ে এক করে দিতে পারত।" কিন্তু সত্যিই, এই কাঠিন্যের দরকার ছিল খুবই, কারণ, তা না হলে, যদি তুমি একবার দেহ থেকে বাইরে যেতে,—অবশ্য তোমাদের মধ্যে বেশীর ভাগই তা করতে পারবে না, কারণ তোমাদের প্রাণময় সত্তা দেহের মতন ওরকম স্বতন্ত্র আকার বিশিষ্ট নয়,—যাই হোক, যদি দেহ থেকে বেরিয়ে প্রাণজগতে প্রবেশ করতে ত তুমি দেখতে পেতে, সেখানে সব কিছুই মিশে গিয়ে খিচুড়ি পাকিয়ে বসে আছে, একটা আর একটার সঙ্গে জড়ামড়ি হয়ে যাচ্ছে, নিজেদের কাটাকাটি, ভাগাভাগি করছে, সবরকমের স্পন্দন উঠছে তাদের মধ্যে থেকে, শক্তির প্রবাহ ছুটছে, যাচ্ছে, আসছে, ঠোকাঠুকি করছে, পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করতে চেষ্টা করছে, যে যার নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে, আত্মসাৎ করছে আবার ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ওদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব-মণ্ডিত কোন একটিকেও খুঁজে পাওয়া এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ওরা হল অদেহী নানা শক্তি, নানা আলোড়ন, নানা বাসনা কামনা, নানা স্পন্দন। অবশ্য বলা যায় না যে ও রাজ্যে স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্ব একেবারেই নেই। আছে। কিন্তু সে সব হল প্রচণ্ড শক্তির পুঞ্জ। যারা এই স্তরে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য গড়ে তুলেছে, তারা হয় বীরোত্তম নয় অসুর, এ দুয়ের এক।

তারপর ধরো, মনোরাজ্যের কথা। যদি তুমি শুধু তোমার বাহ্য মনের সম্বন্ধে সচেতন হও, তোমার মাথাটার, মস্তিষ্কের প্রভাব-মুক্ত হয়ে, শুধু মাত্র দেহগত যে মন তার সম্বন্ধে সচেতন হও ত তুমি স্তম্ভিত হয়ে যাবে—অনেকে ওই রাজ্যটাকে শহরের বাজারের সঙ্গে তুলনা করে, কারণ ওখানে সবকিছুই আসছে, যাচ্ছে, যতরকমের মত, যতরকমের ধারণা, যতরকমের

চিন্তা, কল্পনা আছে, যে সব ওখানে ঢুকছে এদিক দিয়ে, বেরুচ্ছে ওদিক দিয়ে, এই দেখ রয়েছে এখানে, ওই আবার গেল ওখানে, এই করে বেড়াচ্ছে। সত্যিই ওটা যেন একটা মেছো-হাটা, ওখানে শৃঙ্খলার বা গোছগাছের বালাই নেই, তার কারণ ওখানে ধারণা বা মতামত-গুলো সব পরস্পরের সঙ্গে বেমারিমি, ঠোকাঠুকি করে, যত আকস্মিক দুর্ঘটনার ওটা হল একটা আড়ৎ। তাই ওখানে যদি একবার যাও ত তখন চেতনা জাগবে, তখন তুমি সবিস্ময়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করবে, "এদের মধ্যে কোন্‌টা তাহলে আমার মন, যাকে আমি বলি—আমার মন, সেটা কোথায়?"

নিজেকে শুধুমাত্র নিজের স্বরূপে গড়ে তুলতে হলে, বছরের পর বছর ধরে সুদীর্ঘকালের পরিশ্রম চাই। নির্বাচন, সংগঠন, একান্ত নিবিষ্টচিত্তে, বহু যত্নে, বহু বিবেচনায় বিবিধ উপা-দানকে পরস্পর সংযুক্ত করা, শৃঙ্খলাবদ্ধ করা প্রভৃতি হল কাজ। ভেবে দেখ, এই এত কাণ্ড করতে হয় ছোট্ট একটি ব্যাপারের জন্যে, ব্যাপারটি হল, ঠিকভাবে চিন্তা করতে শেখা। বুদ্ধিমান লোকেদের ধারণা যে তাদের চিন্তাগুলো সব সম্পূর্ণ স্বাধীন, একেবারে তাদের বৈশিষ্ট্যের বিকাশ মাত্র। কিন্তু ব্যাপারটি আসলে তা মোটেই নয়। তোমার মনোভাবের অনেকখানিই নির্ভর করে তুমি কোন্ লোকের সঙ্গে কথা বললে, বা কোন বইগুলি পড়লে, কী রকমের আলোচনায় যোগ দিলে, তার ওপর। এমন কি তোমার খাওয়ার পর হজমটা ভাল হল কি মন্দ হল, হয়ত তোমাকে কোন একটা ঘরে আটকা পড়তে হয়েছিল এবং সেখানে ভাল করে বাতাস খেলার উপায় ছিল না, কিংবা হয়ত খোলা মাঠে থাকতে হয়েছে, হয়ত তোমার সামনের প্রাকৃতিক দৃশ্যটা ছিল নয়নাভিরাম, কিংবা হয়ত খুব চড়া রোদ্দুর উঠেছিল, হয়ত বা খুব বৃষ্টি পড়েছিল, এই ধরণের প্রত্যেকটি ঘটনার ওপর তোমার মনের ক্রিয়া যে কতখানি নির্ভর করে তা আর বলবার নয়। তোমাদের নিজেদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নেই এমন কত শত ব্যাপার নিয়ে যে তোমরা মাথা ঘামাও, কতশত রকমের চিন্তা যে তোমরা করে থাক, তা তোমরা খেয়ালই কর না। তাই যাতে তোমাদের চিন্তাগুলো হয়ে ওঠে স্বসংলগ্ন, সংগতিবিশিষ্ট, যুক্তিযুক্ত, তার জন্যে দীর্ঘকাল ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খাটতে হবে।

এরপর ব্যাপারটি কখন অপূর্ব হয়ে ওঠে, জানো? যখন তুমি তোমার মনটিকে বেশ ভাল করে গড়ে তুলতে পেরেছ, সুস্থ, সবল, শক্তিমান করে তুলেছ, তখন প্রথম নির্দেশ যা তুমি পাবে, তা হল: "ও সব ভেঙে দূর করে ফেলে দিতে হবে, তবেই তুমি ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে।" কিন্তু যতক্ষণ তুমি ওই ভাবে নিজেকে গড়ে না তুলছ, ততক্ষণ তুমি ভগবানকে সমর্পণই বা করলে কী এবং তাঁর সঙ্গে মিলে এক হয়ে যাবেই বা কি করে? কারণ তোমার ত তখন ভগবানকে দেবার কিছুই নেই। আছে শুধু নানা বস্তুর তালপাকানো একটি বোঝা, যেটা তোমার আসল স্বরূপই নয়। তাই সবার আগে, তোমার অস্তিত্বকে

যথার্থভাবে গড়ে তুলতে হবে, তবেই তুমি তারপরে আত্ম-উৎসর্গ করতে পারবে। এই খানিক আগে যা বললাম, এখনও আবার সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলাম।

পৃথিবীতে আজও যে অবস্থা বর্তমান তাতে যে বস্তুটি মানুষ সত্যিই ভগবানকে অর্পণ করতে পারে, তা হল তার এই দেহটি। কিন্তু সেটাইত সে তাঁকে দেয় না। হ্যাঁ, মানুষ দেহ চালনা করে যে কাজটা করে তা তাঁকে উৎসর্গ করতে চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমার সঙ্গে উপাদান রয়েছে, যেগুলো খাঁটি নয়।

তুমি চাইছ তোমার দেহটিকে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়ে এক করে দিতে, নয় কি? বেশ, চেষ্টা করে দেখ, কী ভাবে করবে! তুমি পার তোমার মনটিকে মিলিয়ে এক করে দিতে, পার তোমার প্রাণটিকে মিলিয়ে এক করে দিতে। তোমার সকল আবেগকেও দিতে পার ওইভাবে, তোমার সকল আস্পৃহাকেও মিলিয়ে দিয়ে তাঁর মধ্যে বিলীন করে দিতে পার, কিন্তু তোমার দেহটির বেলায় কী কথা? কিভাবে সেটিকে গালিয়ে মিলিয়ে, এক করে দেবে। একে ত আর জল গলন করবার পাথরের চাপিয়ে গালিয়ে এক করতে পার না! (সকলের হাসা)। অথচ সকল বস্তুর মধ্যে তোমার দেহটিই হল একমাত্র বস্তু, যার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে তুমি বলতে পার "আমিই অমুক!"—ধরো, তোমার নামটা উল্লেখ করেই বলা যাক,—যদিও তোমার নাম মানেই, সেটা হল, একটা প্রচলিত রীতি মেনে নেওয়া। যাক্, তা-হলেও একটা বিশেষ নামের দ্বারা তুমি নিজেকে পরিচিত করতে অভ্যস্ত, সুতরাং তোমার সেই নামটাই ব্যবহার করা যাক। তুমি তোমার দেহটিকে দেখিয়ে বলবে, "এই আমি অমুক।"...আয়নাতে তোমার চেহারাটা দেখ। বিশ বছর আগে তুমি যা ছিলে, আর আজকের তুমি যা, তার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে, একেবারে চেনবারই উপায় নেই। কিন্তু তবুও, কিছু একটা আছে, যেটা তোমাকে অসংকোচে বলতে দেয়, "হ্যাঁ, এ আমিই।...আমি হলাম শ্যাম, শ্যাম, যদু...কেউ একটা।" কিন্তু এক্ষেত্রেও যদি সাত বছর অন্তর অন্তর মিলিয়ে দেখ ত লক্ষ্য করবে, তোমার দেহের সব কোষগুলিই বদলে গেছে, আর ও-কেবল একটা অভ্যাসের বশেই তুমি রয়ে গেছ সেই একই। কিন্তু সত্যিই কি তাই, তুমি সেই একই? তোমার শৈশব থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের ফটো যদি থাকে, দশ, বিশ, ত্রিশ—এইভাবে ক্রমানুয়ে, সেগুলো দেখতে কি সব একই রকম? কখন তা হতে পারে না। মানুষ চায় একই ভাবে পরিচিত হতে, তাই সে দিব্যি বলে থাকে সকল বয়সেই সে সেই একই। নইলে তুমি যখন সেই এতটুকু ছিলে, আর আজ যে এত বড়টি হয়েছ, এর মধ্যে বিরাট তফাৎ রয়েছে। সুতরাং দেখতেই পাচ্ছ ত, দেহটি কি করে সেই একই থাকতে পারে।

কিন্তু ভেব না যে, এ সব কথা বলছি তোমাদের কোণঠাসা করবার জন্যে। আমার বলবার উদ্দেশ্য হল যে, ভগবানের হাতে নিঃশেষে নিজের অহংকে সমর্পণ করে তাঁর সঙ্গে এক

হয়ে যেতে চাইবার কথাটা বলার আগে, প্রথমে একটু জানা দরকার, তুমি নিজে বাস্তবিকই কী! অহংকার ত রয়েইছে। এবং তা থাকার প্রয়োজনই হল যে, ওর সাহায্যে তোমার সত্তা হয়ে উঠবে সচেতন, স্বাধীন, স্বাতন্ত্র্যযুক্ত। "স্বাধীন" শব্দটি আমি কি অর্থে ব্যবহার করলাম তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, অর্থাৎ তোমরা যেন এক একটি বেড়ো-ঢাকা না হয়ে ওঠ, যেখানে মাছির ভনভনানির মতন অনুক্ষণ সব কিছুই নিজের স্বাতন্ত্র্য-বর্জিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে, আবার কাটাকাটি, সংঘর্ষ প্রভৃতি করছে। তোমরা যেন বাস করতে পার নিজেরই মধ্যে, অর্থাৎ স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ হয়ে। অহংএর অস্তিত্বের হেতুই হল এই। আর সেই ভাবেই, একই কারণে তোমাদের দেহটিকে আচ্ছাদন করে রয়েছে এই শক্ত পুরু চামড়াটি, যদিও এটা সত্যি যে, দৈহিক শক্তিগুলো এই চামড়াকে ভেদ করে বেরিয়ে গিয়ে কাজ করছে। একটা স্পন্দনের তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে, সেটা বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত যেতে পারে। কিন্তু তথাপি দেহের ওপর এই কঠিন আবরণটি রয়েছে বলেই মানুষ গলে একজন আর একজনের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায় না। কিন্তু মানুষের এই দেহটির মতন অন্যান্য অংশগুলিকেও এই রকম স্বাতন্ত্র্যযুক্ত হতে হবে। আর তারপরে মানুষ তার সব অংশগুলিকে ভগবানের হাতে উৎসর্গ করবে। এর জন্যে বছরের পর বছর ধরে দীর্ঘকাল খাটতে হবে। শুধু নিজের সম্বন্ধে সচেতন মাত্র হলেই কাজ শেষ হল না। তোমার সত্তার প্রত্যেকটি অংশসম্বন্ধে সচেতন হওয়া চাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। কিন্তু সেজন্যে, এই সব অংশগুলির সমষ্টিকে যাকে তুমি বল, 'তুমি স্বয়ং', সেটিকে সমগ্রভাবে তোমার চৈত্যপুরুষের, অর্থাৎ তোমার সত্তার দিব্য-কেন্দ্রের চারিদিক ঘিরে দাঁড় করাতে হবে, যাতে করে উপাদানগুলি সব হয়ে ওঠে এক অখণ্ড বস্তু, একত্র-সংলগ্ন, পূর্ণ-সচেতন। তোমার অন্তরে অবস্থিত ওই দিব্য-কেন্দ্রটি আগে থেকেই ভগবানের হাতে সম্পূর্ণ সমর্পিত বলে, অন্য সব অংশগুলি যদি তাকে ঘিরে সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে, তাহলে তারাও সবাই ভগবৎ সমর্পিত হয়ে উঠবে, আর তারপর যখন ভগবান ভাল বুঝবেন, যখন সময় হবে, যখন স্বাতন্ত্র্য গড়ে তোমার কাজ পূর্ণাঙ্গ হবে, তখন তিনি অনুমতি করবেন যে, তুমি তোমার অহংকে তাঁর সঙ্গে মিশিয়ে এক হয়ে যাও, তখন তোমার অস্তিত্বই শুধু তাঁর জন্যে। কিন্তু এটা স্থির করবেন ভগবানই স্বয়ং। আর সেজন্যে তোমাকে প্রথমে উক্ত সব কাজগুলি করে রাখতে হবে। প্রথমে তোমাকে হয়ে উঠতে হবে এক সচেতন সত্তা, অখণ্ডভাবে, তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত; একমাত্র ভগবানকে অবলম্বন করে, তাঁরই চারিদিকে কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠা চাই, এবং তাঁর দ্বারা পরিচালিত হওয়া চাই।

কিন্তু এত সব করার পরেও আবার আছে আর এক অহং। কারণ এই অহংই যে তোমাকে তোমার স্বাতন্ত্র্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। কিন্তু একবার তোমার নিজেকে গড়ে তোলার কাজটি ভাল করে শেষ হলে, তুমি তখন ভগবানকে বলতে পার, "এই নাও

আমি এখন প্রস্তুত, গ্রহণ করবে কি আমাকে?" আর প্রায়ই তখন ভগবান বলে থাকেন, "হাঁ"। ব্যস, তখনই তোমার সকল কাজের শেষ, সিদ্ধি তখনই লাভ হল, এবং তুমি তখন হয়ে উঠলে দিব্যকর্মের উপযোগী যথার্থ যন্ত্র। কিন্তু সেজন্যে আগে যন্ত্রটিকে গড়ে তুলতে হবে।

তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের এই যে স্কুলে পাঠান হয়, নানারকমের খেলা-ধুলা ও শরীরচর্চার অনুশীলন করান হয়, এ সব কেবল তোমাদের উত্তাক্ত করার আনন্দে? মোটেই তা নয়। এর একমাত্র কারণ হল যে, তোমাদের সত্তার চাই এমন একটা দেহগত কাঠামো, যেটাকে অবলম্বন করে, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে কেমন করে গড়ে তুলতে হয় তা শিখতে পারবে। যদি তোমরা তোমাদের ব্যক্তিত্ব গড়ার কাজ, নিজেদেরকে পূর্ণাঙ্গ করে গড়ে তোলার কাজ, করতে থাক সম্পূর্ণ একা একা, তোমাদের নিজের নিজের ঘরে, কেউ তোমাদের তা করতে স্মরণ করবে না, বা তোমাদের স্কুলে যেতে, শরীরচর্চা করতে বাধ্য করবে না কোনদিন। কিন্তু তোমরা যে তা কর না, এবং করবেও না কোনদিন। এমন একটিও শিশু নেই যে তা করবে। "আর কি করে করতে হয়, তাই যে তারা জানে না। কেউ যদি শিশুকে স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায়গুলি শিখিয়ে না দেয়, তার পক্ষে বেঁচে থাকাই যে অসম্ভব হবে। সে কিছুই করতে শিখবে না, একেবারে কোন কাজই নয়। আমি বেয়াড়া মত খুঁটিনাটির উল্লেখ করতে চাইনা। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক ব্যাপারগুলিও সে ঠিক ঠিক গুছিয়ে করতে পারবেনা, যতক্ষণ না তাকে সেগুলো কিভাবে করতে হয়, তা শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাজে কাজেই, প্রত্যেককেই যদি বিনা সাহায্যে, জীবনের সকল অভিজ্ঞতা অর্জন করতে যেতে হয় একেবারে গোড়া থেকে এক পা এক পা করে, তাহলে নিজেকে গড়ার বহু আগেই সে ভবলীলা সাঙ্গ করবে। তাই যাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রেখেছেন, তাঁদের কথা শোনার মস্ত লাভইত এইখানে। তারা তোমায় বলবেন, "শোন, যদি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে চাও, কয়েক বছরের মধ্যেই, বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় যে জ্ঞান তোমার অগ্রগামীরা লাভ করেছেন তা যদি জানতে চাও, তাহলে এইগুলি করো। শোন, দেখ, পড়।" তারপর বাহ্য জীবনের কর্মক্ষেত্রে তোমাকে হাতে কলমে শিখিয়ে দেওয়া হবে, এটা করতে হয় এইভাবে, ওটা করতে হয় ওই ভাবে, সেটা করতে হয় তাইভাবে...। তারপর একবার যখন সেগুলো খানিকটা তোমার জানা হয়ে যাবে, তখন, তোমার যদি প্রতিভা থাকে, তাহলে, তুমি নিজেই তোমার উপযুক্ত পন্থা ঠিক বেছে নিতে পারবে। কিন্তু সবার আগে চাই নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে শেখা, এবং স্বচ্ছন্দে চলতে পারা। বিনা সাহায্যে একেবারে একা একা এসব শেখা মোটেই সোজা ব্যাপার নয়। আর সব কিছুর বেলাতেই ওই কথা।

প্রথমে নিজেকে গড়ে উঠতে হবে, এবং তার জন্যেই শিক্ষার প্রয়োজন।

আবির্ভাব

শ্রীরবি গুপ্ত

আজি প্রশান্ত মধুধি জলে তব বিমৌন-সুর
প্রথম উষার শুভ্রতা এই ফুটিছে গগন-ভালে ;
সে কোন্ বহ্নি-স্বপন-সুষমা হেরে দিগন্ত দূর—
তারি অনন্ত একাগ্রতায় যুগের রজনী জ্বালে।

সকল অবনী অমল আবির্ভাবের লগ্ন যাপে
তোমার গভীর-নিহিত নিবিড় মাধুরী-অপেক্ষায় ;
উদয়-শঙ্খে যুগ-সঞ্চিত শঙ্কিত ছায়া কাঁপে,
ধরণী ধূলার তপনে তোমার অমরার বাণী পায়।

সুচির কালের সুচির স্বপন ! কোথা হ'তে এলে তুমি,
সমীরে সমীরে কোন্ সুরভিরা অনাহত ঢেউ তোলে ;
সুদূর অন্তবিহীন-নয়ন কিরণে ধরণী চুমি',
সুস্মিতা ওগো, তোমারি দোলায় ছন্দ ধূলার দোলে।

মন্ত্রে তোমার জ্বালো নব আলো, রঞ্জিত করো যামি,
আকাশপারের কোন্ আকাশের তপনেরা আসে নামি'।

MENDED-2008

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্ত্তিকা

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ও দর্শন বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির পাঠমালা

পাঠমালা সিরিজ

১।	মা	শ্রীবিলাস চৌধুরী	।৹
২।	চেতনার অবতরণ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
৩।	শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ	শ্রীঅনিলবরণ রায়	১
৪।	পঁচিশ প্রদীপ (কাব্যগ্রন্থ)	নলিনীকান্ত	১৷৹
৫—৭।	মনন্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	৩৷৹
৮-১০।	শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্ত্তমান জগৎ	শ্রীঅনিলবরণ রায়	৷৵
১১।	এ-যুগের সাধনা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৷৹
১২।	কে এই মা?	পণ্ডপতি	২৷৹

শ্রীঅরবিন্দ

দিব্য-জীবন (দুই খণ্ডে সমাপ্ত) ১ম খণ্ড ৮৲ ; ২য় খণ্ড ১৪৲

ভারতের নবজন্ম	...	১৷৹
কর্ম্মযোগী	...	১৷৹

শ্রীমা

ছোটদের গল্প	১৷৹
পুরানো লেখা	১৷৹
শিক্ষা	১৷৹
মায়ের আলাপ	২৷৹
ভাবী-কালে	৸৹

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র ও মুক্তিচতুষ্টয় ১৲